সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা



আমিই রানা ১

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-৭০

দুই খণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

আমিই রানা-১

তেল আবিবের অভিজাত এলাকা জাফার
একটি ফ্ল্যাটে নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলো রানা।
ঘুম ভাঙলো নরওয়ের অসলো শহরে
এক হোটেল কক্ষে।
হাতের ঘড়িটা বদলে গেলো কি করে ? পরনে
পাজামা এলো কোত্থেকে ? রাস্তার
দু'পাশে দোকানগুলোর সাইনবোর্ডে দুর্বোধ্য, অচেনা
ভাষা কেন ? স্বপ্ন দেখছে ?
বাথরুমে ঢুকলো রানা। থমকে দাঁড়ালো আয়নার
সামনে। কে ও ? চিনতে পারছে না নিজেকে!

আশ্চর্য! স্মরণশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে
ফেলেছে ও। শুধু মনে আছে, ওর নাম
মাসুদ রানা। মনে আছে, ও একজন
দেশপ্রেমিক ইসরায়েলী!

তেরো টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১, ২
রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২
কায়রো * মৃত্যু-প্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা
ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ?
বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা
তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১, ২
কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২
গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২ * পপি * জিপসী-১, ২
আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো, সোহানা-১, ২
হাইজ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২
পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১ ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১, ২
লেনিনগ্রাদ-১, ২

সেবা প্রকাশনী

আমিই রানা-১

দুই খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-৭০

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৭৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন, ১৯৮৩

রচনা : বিদেশী কাহিনীর
ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
খন্দকার মুদ্রণালয়
১২/১, পূর্ণ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দুরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

AMIYEE RANA
Masud Rana-70
By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

প্রতিটি কাহিনী আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন।

এক

মাসুদ রানা।

একা শুয়ে বিছানায়। চিৎ হয়ে। ঘুমোচ্ছে।

অদ্ভুত এক আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মুঠো পাকানো ডান হাতটা পড়ে আছে কপালের উপর। কার উপর যেন ক্ষেপে আছে ও, নিজের অজ্ঞাতেই। ঘুমের মধ্যেই তুম করে একটা ঘুসি মেরে বসবে যেন। বুকটা উঠছে, নামছে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক, গভীর এবং নিয়মিত।

দৈনন্দিন সাময়িক মৃত্যুর গভীর তলদেশ থেকে উঠে আসছে রানা, ঘুম ভাঙছে ওর। আরো দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছে। পাতা দিয়ে মোড়া চোখের ভিতর মণি দু'টো একটু একটু নড়ছে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। হাতটা নেমে গেলো কপাল থেকে। পাশ ফিরে শুলো। কয়েক ইঞ্চি নেমে এলো মাথাটা বালিশ থেকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে শুয়ে থাকলো ও। আবার নড়ছে মণি দু'টো। একটু কুঁচকে উঠলো পাতা দু'টো, একটু কাঁপলো, তারপর টান টান হয়ে উঠলো। ভাঁজ হয়ে উঠে গেলো উপর দিকে।

চোখ মেললো রানা। বিছানার সামনে শূন্য সাদা দেয়াল দেখতে পাচ্ছে। দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে বাতাসে ভরে নিলো ফুসফুস। হাত দু'টো উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। হাই উঠছে বুঝতে পেরে ডান হাতটা নামিয়ে এনে মুখের সামনে রাখলো। টান টান করলো পা দু'টো। বালিশের উপর নেড়েচেড়ে ঠিক জায়গামতো বসালো মাথাটাকে। বাঁ-হাত মুখের সামনে এনে হাই তুললো আরেকটা। তারপর অলস ভঙ্গিতে চোখের সামনে নিয়ে এলো হাতটাকে। রিস্টওয়াচ দেখছে।

ঘড়ির তিনটে কাঁটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ঠিক বারোটা বাজে।

কুঁচকে উঠলো ভুরু দু'টো। হাত ঝাঁকিয়ে নাড়া দিলো ঘড়িটাকে, কানের সাথে ঠেকিয়ে ধরলো।

টিক্ টিক্ চলছে ঘড়ি। চোখের সামনে নিয়ে এলো সেটাকে, দেখতে পাচ্ছে সেকেণ্ডের কাঁটাটা তার বৃত্ত ধরে ঘুরতে শুরু করেছে আবার।

হঠাৎ কি যে হ'লো, ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলো রানা। ঘড়িটার দিকে চোখ। মাঝরাত, নাকি দিন দুপুর—এসব নিয়ে কিছু ভাবছে না এখন। হঠাৎ ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা, ঘড়িটা ওর নয়। সাধারণত একটা অটোমেটিক ওমেগা পরে ও। এটা ওমেগা নয়, সোনালী রঙের পাটেক ফিলিপ। ওমেগার সাথে ছিলো ফ্লেক্সিবল ধাতব ব্যাণ্ড, এটার রয়েছে সাদাসিধে চামড়ার বেল্ট।

কপালে চিন্তার একটা রেখা ফুটে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি সতর্ক। ধীরে ধীরে তুলছে মুখ। কামরাটার চারদিকে তাকাচ্ছে। আরেকটা

ধাক্কা খেলো সাথে সাথে। অচেনা কামরা। এর আগে কখনো এখানে আসেনি রানা।

বুকের ভিতর দিকের দেয়ালে দ্রুত তালে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, অনুভব করছে রানা। আঙ্গুলে শীতল সিল্কের স্পর্শ পেয়ে চোখ নামালো। পাজামা পরে আছে ও। অথচ এই পোশাক পরে শোয়া অভ্যাস নয় ওর। কার এটা, কোত্থেকে এলো, কখন পরেছে—কিছুই মনে পড়ছে না।

চোখ থেকে ঘুম এখনো কাটেনি পুরোপুরি। আবার শুয়ে পড়ে চোখ বুজতে ইচ্ছে করছে ওর। বুঝতে পারছে, স্বপ্নটা দেখা শেষ করে ঠিকমতো ওর নিজের বিছানায় জেগে উঠলেই সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু তলপেটে একটা চাপ অনুভব করছে, এখনই একবার বাথরূমে না গেলেই নয়। কোলের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে পা দু'টো ঝুলিয়ে দিলো বিছানার নিচে পাজামাটা দেখলো আবার। আমি হাসপাতালে রয়েছি, হঠাৎ ভাবলো ও, নিশ্চয়ই কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করেছি। কিন্তু স্মৃতি বলছে উল্টো কথা। পরিষ্কার মনে আছে মেয়েটার নাম। তাতিনা। তেল আবিবের অভিজাত এলাকায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে রানা, ডিনার খেয়ে সেখানেই তাতিনাকে নিয়ে উঠেছে ও। একটু রাত করে শুয়েছে ওরা। সন্ধ্যার দিকে সচরাচর যতটুকু ড্রিঙ্ক করে তার চেয়ে একটু বেশি ঢেলেছে গলায়। কিন্তু তাতে কি। মদ খেয়ে মাতাল হলেও, নিরাপদে ফ্ল্যাটে পৌঁছেচে ও, কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটায়নি। আবছা ভাবে হলেও মনে আছে সব।

আঙ্গুলে সিল্কের পিচ্ছিল কোমলতা অনুভব করছে রানা। ভাবছে···তাছাড়া তেল আবিব মেডিকেল কলেজের পোশাক নয় এই

পাজামা। ওখানে এর আগে থেকেছে ও। পকেটের কাছে কোনো মনোগ্রাম থাকে না। এটার রয়েছে।

এমব্রয়ডারি করা মনোগ্রামের লেখাটা পড়তে চেষ্টা করলো ও। অক্ষরগুলো উল্টোভাবে সাজানো বলে মনে হচ্ছে, পড়া যাচ্ছে না।

মেঝেতে দাঁড়ালো রানা। আরেকবার কামরাটার দিকে ভালো করে তাকাতেই বুঝলো, একটা হোটেলে রয়েছে ও। শুধু একটা হোটেলরুমেই স্যুটকেস রাখার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি র‍্যাক দেখা যায়। র‍্যাকে একটা দামী স্যুটকেসও দেখতে পাচ্ছে ও। তিন পা এগিয়ে র‍্যাকটার সামনে থামলো। আনকোরা নতুন স্যুটকেস, কোথাও এক চুল দাগ পড়েনি এখনো। চামড়ার গা মসৃণ, চকচক করছে। একপাশে স্পষ্টভাবে তিনটে অক্ষর সাদা রঙ দিয়ে এঁকে রাখা হয়েছে। এ. পি. ফ.।

দপ্ দপ্ করছে কপালের দু'পাশ। অতিরিক্ত মদ খাবার কুফল, ভাবলো ও। মুখের ভিতর শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। আবার কামরাটার চারদিকে চোখ বুলালো ও। একটা চেয়ারের পেছনে ঝুলছে জ্যাকেটটা, ড্রেসিং টেবিলের উপর সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, মানিব্যাগ, চাবির গোছা ইত্যাদি ব্যক্তিগত জিনিসগুলো পড়ে রয়েছে। ওদিকে যাবে, এমন সময় তলপেটের চাপটা অসহ্য মনে হলো। একটা বাথরুম না পেলেই নয় আর।

বেডরুমটা ইংরেজি এল অক্ষরের মতো, বাঁক নিয়ে চলে গেছে আরেকদিকে। সেদিকে এগোলো রানা। বাঁক নিতেই কাঠের পার্টি-শন দেয়া দু'টো ছোট ঘর দেখলো দু'পাশে ধাক্কা দিয়ে একটার দরজা খুললো। এটা একটা ওয়ারড্রোব, কাপড়-চোপড়ে ভর্তি, ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ঘরটার মুখোমুখি হলো। দরজা ঠেলে ভিতরে অন্ধ-

কার দেখলো। চৌকাঠ পেরিয়ে সুইচবোর্ডের সন্ধানে দেয়াল হাতড়াচ্ছে। সুইচে চাপ দিয়ে আলো জ্বালাতেই সাদা মার্বেল পাথরের বাথরুম দেখতে পেলো।

নিজেকে হালকা করার ফাঁকে দু'টো ব্যাপার নিয়ে ভাবছে রানা। কেন যেন খুঁত খুঁত করছিলো মনটা। এখন কারণটা টের পেলো হঠাৎ। বিদঘুটে কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য করছে ও, অথচ, ঘুম ঘুম ভাবটা এখনো লেগে রয়েছে চোখে, যেন পুরোপুরি জেগে নেই ও। এমন হবার কথা নয়।

'উফ্!' ব্যথায় মুখ বিকৃত করলো রানা। চিমটিটা জোরে হয়ে গেছে।

আরেকটা ব্যাপার। কি যেন গোলমাল আছে ইলেকট্রিক সুইচটায়। ভাবতে গিয়ে ধরা পড়লো গোলমালটা। সুইচ নিচের দিকে নামিয়ে আনলে আলো জ্বলে, কিন্তু খানিক আগে বাথরুমের আলো জ্বালতে গিয়ে অন্ধকারে আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করেছে ও, সুইচগুলো সব নিচের দিকে নামানো রয়েছে। উপর দিকে উঠিয়ে দিতে জ্বলেছে আলো।

বেসিনের সামনে দাঁড়ালো রানা। শেলফে দু'টো পানি-ভর্তি গ্লাস কাগজ দিয়ে চাপা দেয়া। কাগজ সরিয়ে একটা গ্লাস তুলে নিলো ও। ঢক ঢক করে পানিটুকু খেলো। এ পর্যন্ত মাত্র আড়াই মিনিট হয়েছে ঘুম ভেঙেছে ওর।

গ্লাসটা রেখে দিয়ে বাঁ চোখটা হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঘষলো, কেমন যেন টাটিয়ে আছে জায়গাটা। তারপর বেসিনের উপর দেয়ালের গায়ে লাগানো আয়নাটার দিকে তাকালো।

কে?

কে লোকটা।

ঝন্ করে ঘুরে উঠলো মাথাটা।

দুই

অসম্ভব ব্যাপারটা এক সেকেণ্ড দেখলো রানা, তারপর ঝট করে ঘুরলো পেছন দিকে। কেউ নেই। বাথরুমে ও একা। তাহলে? কে ঐ আয়নায় দেখা লোকটা?

তীব্র এক আতঙ্ক গ্রাস করলো রানাকে। তিক্ত খানিকটা পিত্ত রস উঠে এলো গলা দিয়ে। দম আটকে আসতে চাইছে। রীতিমতো হাঁপাচ্ছে সে।

সাহস সঞ্চয় করার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রানা। ধীরে ধীরে ঘুরলো আবার। কিন্তু চট করে আয়নায় তাকালো না। চোখ দু'টো বুজে আছে। খুললো। পরনের পাজামাটা দেখতে পাচ্ছে আয়নায়। হাত দু'টো দেখতে পাচ্ছে। ধীরে ধীরে উপরে উঠছে দৃষ্টি।

ঝট্ করে মুখের দিকে তাকালো আবার রানা। সাথে সাথে বুদ্ধি লোপ পেলো ওর। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় জীবনে পড়েনি

কখনো সে।

আবার যখন সম্বিত ফিরে পেলো, দেখলো বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে ও। শরীরটা ঝুঁকে পড়েছে বালিশের দিকে। দু'হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে আছে বিছানার চাদরটা। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। সারা মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। দুই জুলফি বেয়ে সড় সড় করে নেমে আসছে দু'টো ধারা। চামড়ার নিচে রক্ত যেন টগবগ করে ছুটছে। নিচু গলায় অবোধ শিশুর মতো বিরতিহীন আউড়ে চলেছে, 'আমি মাসুদ রানা। আমি মাসুদ রানা। আমি মাসুদ রানা।'

ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে এলো শ্বাস-প্রশ্বাস। চেহারা চিনতে না পারার প্রচণ্ড ধাক্কাটা সামলে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। ধীরে ধীরে মাথাটা নামালো বালিশে, সাদা ডিসটেম্পার করা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করে চলেছে সে একই কথা: আমি মাসুদ রানা।

নিজের পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেয়ে একটু যেন স্বস্তি ফিরে আসছে ওর মধ্যে গলাটা কাঁপা কাঁপা, কিন্তু চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওরই।

ধীরে ধীরে গলার স্বর আরো স্পষ্ট, আরো দৃঢ় হলো ওর, 'আমি মাসুদ রানা। তেল আবিবের অভিজাত এলাকা জাফার একটা ফ্ল্যাটে ছিলাম আমি। গত রাতে, দশটার দিকে, তাতিনাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকি। আমরা বিছানায় উঠি সাড়ে দশটায়। সন্ধ্যার দিকে একটু মাতাল হয়েছিলাম। ভাঙা কাঁচ দিয়ে সামান্য একটু কেটে গিয়েছিলো। কিন্তু বিছানায় ওঠার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা করলো রানা, তারপর বললো, 'একটা নাইট ক্লাবে বসে মদ খেয়েছি আমি। তখন সন্ধ্যা সাতটা হবে। বোতলটা টেবিলের ওপর খুব জোরে নামাতে সেটা ভেঙে গিয়েছিলো। মাতলামো বলতে এইটুকু। আর কিছু নয়। সুতরাং, মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম, এবং তারপর থেকে যা ঘটছে সবই স্বপ্নের মধ্যে, তা সত্যি নয়। তাহলে ব্যাপারটা কি?' বাঁ হাতটা তুললো রানা। নিজের গালে মৃদু চাপড় মারছে। 'কি এটা?'

ধীরে ধীরে উঠে বসলো রানা। বাথরুমে আরেকবার ওকে যেতেই হবে, জানে ও। গিঁট দিয়ে শক্ত করে বাঁধার চেষ্টা করছে স্নায়ুকে। বিছানা থেকে নামলো, দাঁড়ালো মেঝেতে। আবার সেই কাঁপুনিটা আরম্ভ হলো সারা শরীরে।

কাঁপুনিটা যতক্ষণ না থামলো, অপেক্ষা করলো রানা। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে। মুখোমুখি হলো অচেনা লোকটার সাথে আয়নার সামনে।

যে লোকটা পাল্টা তাকিয়ে আছে ওর দিকে তার বয়স ওর চেয়ে অনেক বেশি। পঞ্চাশ হওয়াও বিচিত্র নয়, অনুমান করলো রানা। রানার গোঁফ ছিলো, এর নেই। মাথা ভর্তি চুল ছিলো রানার, ওর কপালের উপর ইঞ্চি দেড়েক প্রশস্ত একটা টাক চক্‌চক করছে। স্পষ্ট কোনো দাগ ছিলো না রানার মুখে, কিন্তু এ লোকটার মুখের বাঁ দিকে একটা পুরানো দাগ রয়েছে। কপালের প্রায় মাঝখান থেকে শুরু হয়ে চোখের পাশ ঘেঁষে নেমে এসেছে দাগটা প্রায় ঠোঁটের প্রান্ত পর্যন্ত। বাঁ চোখের পাতা ঝুলে আছে, শুকনো পুরানো ক্ষতটার জন্যে কিনা বলা মুশকিল। এছাড়া, ডান দিকের চোয়ালের কাছে

ছোট্ট একটা লাল জরুলও রয়েছে।

এগুলোই সব নয়। তা যদি হতো, এতটা ভয় পেতো না রানা। আসল ব্যাপার হলো, মুখটা আলাদা। সম্পূর্ণ অন্য রকম।

রানা সুদর্শন। চেহারাটা গর্ব করার মতো। কিন্তু এই অপরিচিত মুখটা মাংসল এবং থ্যাবড়া। নাকটা গোল। থুতনিটা দু'ভাগে ভাগ করা।

লোকটার দাঁত দেখার জন্যে হাঁ করলো রানা। বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠলো নিচের সারির সামনের একটা সোনার দাঁত। মুখ এবং চোখ দু'টোই বন্ধ করে ফেললো রানা। আবার শুরু হয়েছে কাঁপুনিটা

আবার যখন চোখ মেললো ও, চোখ দু'টোকে কঠিন শাসনে বেঁধে রাখলো যাতে আয়নার চোখ দু'টোর দিকে না তাকায়। দৃষ্টি নামিয়ে তাকালো শক্ত করে বেসিনের কিনারা ধরে থাকা হাত দু'টোর দিকে। এ দু'টোও আলাদা। বয়স হয়েছে চামড়ার। নখগুলো ছেঁটে ছোট করা হয়েছে, যেন দাঁত দিয়ে কেটেছে কেউ। বুড়ো আঙুলের উল্টোদিকে কালো একটা তিল রয়েছে; তর্জনী আর মধ্যমায় নিকোটিনের দাগ দেখলো ও।

অথচ বেশ কিছুদিন থেকে পাইপ খাচ্ছে রানা।

অন্ধের মতো আয়নার দিক থেকে ঘুরে বেডরুমে ফিরে এলো ও। বিছানার কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসলো। 'আমি মাসুদ রানা!' বিড় বিড় করে বললো ও আবার। কাঁপুনিটা ফিরে আসছে আবার। ইচ্ছাশক্তির জোরে দ্রুত থামালো সেটাকে। মনে মনে বললো, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো রানা। জানালার দিকে এগোচ্ছে। রাস্তা

থেকে যে শব্দগুলো আসছে সেগুলো কেমন যেন অপরিচিত ঠেকছে ওর কানে।

জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো ও।

জানালার নিচে দিয়েই একটা ট্রাম কার ছুটে যাচ্ছে।

ট্রাম! তেল আবিবে ট্রাম নেই।

চোখ ধাঁধানো রোদ বাইরে। রাস্তার এপারে হোটেলের বাগান। বড় বড় ছাতার নিচে টেবিল চেয়ার। লোকজন বসে লাঞ্চ খাচ্ছে

আরেকটা ট্রামের শব্দ পেয়ে আবার রাস্তার দিকে তাকালো রানা। এটা আগের মতোই ঝক্কড় মার্কা একটা ট্রাম। কপালে গন্তব্য-স্থানের নাম লেখা রয়েছে। লেখাটা পড়তে গিয়ে হোঁচট খেলো রানা। অচেনা ভাষা। পড়তে পারছে না। কোন্ ভাষা, তাও জানা নেই ওর।

রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোর সাইনবোর্ডে চোখ বুলালো ও। দুর্বোধ্য, পড়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা কথা মাথায় এলো। মারা যায়নি তো সে? কোনো কারণে চট্ করে মরে গিয়ে অন্য জগতে চলে এসেছে বলেই চিনতে পারছে না কিছু? মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিলো রানা চিন্তাটা।

মাথার ব্যথাটা বাড়ছে। পর্দা টেনে দিয়ে প্রখর রোদ থেকে চোখ দু'টোকে রক্ষা করলো ও। ঘুরে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে এগোলো ড্রেসিং টেবিলের দিকে।

ড্রেসিং টেবিলের উপর সোনার একটা সিগারেট কেস, গ্যাস লাইটার, মানি ব্যাগ এবং কিছু খুচরো পয়সা পড়ে রয়েছে। সিগারেট কেসটা আগে কখনো দেখেছে বলে মনে পড়লো না রানার।

লাইটারটাও ওর নয়। মোটাসোটা একটা নোটবুক রয়েছে। ওর নয়। ওর জিনিস, পাইপ ও পাউচ, দু'টোর একটাও দেখতে পাচ্ছে না। ধীরে ধীরে বসলো রানা। মাথাটা খসে পড়ে যেতে চাইছে কাঁধ থেকে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বাললো। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো একটা খুচরো পয়সা। এক দিকে মাংসল এক লোকের ছবি খোদাই করা রয়েছে, চেহারার সাথে রোম সম্রাটের মিল রয়েছে। স্পষ্ট কয়েকটা অক্ষর পড়তে পারছে রানা : OLAV. V. R.

মুদ্রাটার উল্টো পিঠ দেখছে রানা। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়া। লেখা রয়েছে : Krone Norge.

তার মানে, নরওয়ে!

হঠাৎ আবার বন্ করে ঘুরে গেলো মাথাটা। মুদ্রাটা রেখে দিয়ে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলো দু'দিক থেকে মাথাটা। কয়েক মুহূর্ত পর সুস্থ বোধ করলো একটু। কিন্তু মাথার ব্যথাটা বরং বাড়লো আরো।

মানিব্যাগটা তুলে নিলো রানা। দ্রুত দেখলো পকেটগুলো, তারপর ভিতরে যা ছিলো বের করলো সব একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স, আনাতোলি প, ফিলাতভের নামে। ঠিকানা : হ্যাপি ভিলা, ম্যাডোনা এভিনিউ, কারকাস, তেল আবিব। মাথার পেছনের চুল খাড়া হয়ে গেলো রানার সইটার উপর চোখ পড়তেই। ওর নিজের হাতের লেখা ওটা। নামটা? না, যতদূর মনে পড়ছে, আনাতোলি প, ফিলাতভ ওর নাম নয়। ওর নাম মাসুদ রানা। কিন্তু হাতের লেখাটা ওর, কোনো সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে।

হাত বাড়িয়ে একটা কলম তুলে নিলো রানা। একই সাথে এটা একটা কলম এবং বলপয়েন্ট। লেখার জন্যে কিছু একটা খুঁজছে ও এদিক ওদিক তাকিয়ে। তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। টেনে

ড্রেসিং টেবিলের সামনের দেরাজটা খুললো। একটা ফোল্ডারের ভিতর রাইটিং পেপার এবং অনেকগুলো এনভেলাপ দেখলো। রাইটিং পেপারের মাথায় হেডিং দেখে থমকে গেলো বাড়ানো হাতটা। ঝরঝরে ছাপার অক্ষরে লেটার প্যাডের মাথায় লেখা রয়েছে : হোটেল কন্টিনেন্টাল, স্টোর্টিংস গাটা, অসলো।

কাগজের গায়ে ঠেকার জন্যে কলমের ডগা এগোচ্ছে, রানা লক্ষ্য করলো, কলম ধরা হাতটা কাঁপছে ওর। কিন্তু সইটা কলম চেপে করতে পারলো—মাসুদ রানা। পরিচিত আঁচড়, টান ইত্যাদি লক্ষ্য করে আত্মবিশ্বাস একটু বাড়লো ওর। এরপর আরেকটা সই করলো : আনাতোলি প, ফিলাতভ। ড্রাইভিং লাইসেন্সটা তুলে নিয়ে সেটার সই আর সদ্য করা সইটা মিলিয়ে দেখলো। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। দু'টো সই হুবহু এক, ওর নিজের হাতের স্বাক্ষর।

মোটসোটা নোট বুকের মতো দেখতে কুক'স ট্রাভেলার্স চেকের সইটাও ওরই করা। চেকগুলো গুণলো রানা। প্রতিটি দু'শো পাউণ্ডের, মোট বত্রিশটা। ছয় হাজার চারশো পাউণ্ড সর্বমোট। ও যদি সত্যি ফিলাতভ হয়, ধনী লোক বলতে হয় ওকে। মাথা ব্যথাটা বেড়ে গেলো আরো।

ফিলাতভের নাম ঠিকানা লেখা ডজনখানেক ভিজিটিং কার্ড আর প্রচুর নরওয়েজিয়ান কারেন্সি রয়েছে। টাকাগুলো গুণে দেখার আগ্রহ হলো না ওর। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছাটা জাগছে আবার। ভাবছে রানা, ঘুম থেকে নতুন করে জেগে উঠে ও হয়তো দেখবে, কয়েক হাজার মাইল দূরে তেল আবিবে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে ও।

ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেললো রানা। ড্রেসিং টেবিলের

আয়নায় তাকাতে গিয়েও তাকালো না। ডান হাতের তর্জনিটা বুলালো নিচের ঠোঁটে। তারপর আঙুলটা চোখের সামনে আনলো। তাজা লাল রক্ত দেখতে পাচ্ছে ও।

স্বপ্ন দেখছে না ও। এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তাহলে কি? তেল আবিবে মাসুদ রানা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো, ঘুম ভাঙলো তার নরওয়েতে, অন্য আরেক মানুষ হয়ে। এক মিনিট! ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ঘুম থেকে জেগে নিজেকে মাসুদ রানা হিসেবে জানতে ভুল করেনি ও। চিনতে? হ্যাঁ, চিনতে পারেনি। কারণ, চেহারাটা ওর নয়। অন্য লোকের। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? ভিতরে ও মাসুদ রানাই আছে। কিন্তু বাইরে আনাতোলি প, ফিলাতভ।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করতে পারছে। কিন্তু থেকে থেকে মোচড় খাচ্ছে পেটটা। কারণটা হঠাৎ বুঝতে পারলো ও। সাংঘাতিক ক্ষিদে লেগেছে ওর। কাহিল এবং দুর্বল বোধ করার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। কিন্তু সেই সাথে নতুন একটা প্রশ্ন উদয় হলো মনে। এমন প্রচণ্ড ক্ষিদে লাগার কারণ কি? গত রাতে সাড়ে সাতটার দিকে নাইট ক্লাবে ঠেসে ডিনার খেয়েছে ও। তাহলে?

এর মধ্যেও কোথাও একটা গোলমাল আছে।

বেডরুমে ফিরে এলো রানা। টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। হঠাৎ মনস্থির করে ক্রাডল থেকে তুলে নিলো রিসিভারটা। কানে ঠেকালো। 'রুম সার্ভিসকে চাই,' ইংরেজীতে বললো রানা। নিজের কণ্ঠস্বর কেমন যেন কর্কশ আর অপরিচিত শোনালো কানে।

অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেলো। বিদেশী টান রয়েছে উচ্চারণে। 'রুম সার্ভিস।'

'কিছু খেতে চাই আমি,' বললো রানা। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো রিস্টওয়াচে। প্রায় দু'টো বাজে, 'হালকা কিছু লাঞ্চ।'

'ওপেন স্যাণ্ড উইচ?' অনুমতি চাইলো রুম সার্ভিস।

'চলবে,' বললো রানা। 'সাথে কফি।'

'ইয়েস, স্যার। স্যার, রুম নাম্বারটা···?'

জানে না রানা। দ্রুত চারদিকে তাকালো। জানালার কাছে নিচু কফি টেবিলে একটা চাবির গোছা পড়ে রয়েছে। হাত বাড়িয়ে গোছাটা নিলো। প্রত্যেকটি চাবিতে নাম্বার রয়েছে। 'থারটি সিক্স, থার্ড ফ্লোর,' বললো রানা। ঢোক গিললো।

'ভেরি গুড, স্যার।'

'খবরের কাগজ পাঠাতে পারো?' জানতে চাইলো

'ইংলিশ নাকি নরওয়েজিয়ান, স্যার?'

'দু'টোই।'

'দ্য টাইমস্?'

'চলবে। এবং একই মানের স্থানীয় একটা দৈনিক। শোনো, বেয়ারা যখন আসবে আমি হয়তো তখন বাথরুমে থাকবো। টেবিলে রেখে যেতে বলো সব।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

একটু স্বস্তির সাথে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো রানা। লোকজনের সামনাসামনি এক সময় ওকে হতেই হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন ইচ্ছা নেই। হাজার হাজার প্রশ্ন জমে আছে মনের ভিতর এক এক করে সবগুলোর উত্তর পাবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তার আগে আরেকটু ধাতস্থ হবার সময় দিতে চায় নিজেকে। লোকজন ওকে দেখেই অনেক প্রশ্ন করতে পারে, ফিলাতভ হিসেবে উত্তর

দিতে হবে ওকে। ভিতরে রানা হয়ে বাইরে ফিলাতভের মুখোশ পরে অভিনয় করা খুব সহজ কাজ হবে না, বুঝতে পারছে ও।

চেয়ার থেকে ড্রেসিং গাউন তুলে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো ও প্রথমেই তোয়ালে দিয়ে ঢেকে নিলো আয়নাটা।

গরম পানি দিয়ে শাওয়ারটা সেরে নিয়ে পাজামাটা ছাড়লো। হাতে সেঁটে থাকা স্টিকিং প্লাস্টারটা আগেই লক্ষ্য করেছে, সেটা খুলে ফেলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিলো নিজেকে। কী না কি দেখবে প্লাস্টারের নিচে, এখন বরং থাক।

কাপড় বদলাচ্ছে, এমন সময় চামচ আর প্লেটের টুংটাং আওয়াজ ভেসে এলো বেডরুম থেকে। একটু পর দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেলো রানা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো কেউ নেই কামরায়। টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে রেখে চলে গেছে বেয়ারা।

ইতিমধ্যে হাঁপিয়ে গেছে ও। উঁচু একটা টুলে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাঁ পায়ের হাঁটুর ইঞ্চি তিনেক নিচে পুরনো একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন পরীক্ষা করতে শুরু করলো। কালচে বাদামী রঙের লম্বাটে একটা দাগ। কি থেকে ক্ষতটা হয়েছিলো মনে আছে রানার। তখন আট বছর বয়স ওর। একটা বাইসাইকেল কিনে দিয়েছিলো ওর বাবা। সেই সাইকেল থেকে প্রথমবার পড়ে গিয়ে হাঁটুর নিচে এই ক্ষতটা সৃষ্টি হয়েছিলো।

মাথা তুলে হাসলো রানা। আগের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ বোধ করছে এখন। নিজের ছোট বেলার একটা ঘটনা মনে করতে পেরে নিজের সম্পর্কে প্রচুর আস্থা অনুভব করছে ও। অন্তত এই ক্ষতচিহ্নটা ফিলাতভের নয়।

হঠাৎ দপ করে নিভে গেলো মুখের হাসি। শূন্য সাদা দেয়ালের

দিকে তাকিয়ে আছে রানা। হতভম্ব, উদ্‌ভ্রান্ত দেখালো ওকে। আর সব কথা? আর সব ঘটনা? ভাবছে ও। ওর বাবার চেহারা? মায়ের মুখ? স্কুলের মাস্টার, বন্ধু-বান্ধবদের স্মৃতি? কোথায় সব? মনে পড়ছে না কেন?

শূন্য সাদা দেয়ালের মতো ফাঁকা সব। কিছুই মনে করতে পারছে না রানা। হাত তুলে মাথায় মৃদু ঘুসি মারছে। কয়েকবার নাড়া দিলো দু'হাত দিয়ে ধরে মাথাটাকে।

কিছুই মনে পড়ছে না! কিচ্ছু না!

কে বা কারা, জানে না রানা, ওর চেহারাটা বদলে দিয়েছে। সেই সাথে ওর মনের পর্দা থেকে চেঁছে তুলে নিয়েছে সমস্ত স্মৃতি। অতীত ভুলে গেছে রানা।

তিন

হাঁটুর নিচের দাগটার বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে, অনুভব করছে রানা। ফিলাতভ হয়ে নিজেকে মাসুদ রানা হিসাবে কল্পনা করছে না, এটা তার প্রমাণ। অতীত মনে না পড়লেও, এটুকু অন্তত সঠিক। নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছে, ও মাসুদ রানা। ফিলাতভ নয়।

ফিলাতভের মুখ থেকে খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো কামিয়ে ফেললো রানা। ফিলাতভ একটু পিছিয়ে পড়া লোক, দাড়ি কামাবার সরঞ্জামগুলো দেখে অন্তত তাই মনে হলো রানার। ইলেকট্রিক শেভার নয়, সে ব্যবহার করে সেফটি রেজার। একে মুখটা নিজের নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত, তার উপর ব্লেড চালানোয় অভ্যস্ত নয়, তাই দাড়ি কামাতে গিয়ে ফিলাতভের মুখের দু'জায়গায় একটু একটু কেটে ফেললো রানা। কাজটা শেষ করে খবরের কাগজ নিয়ে টেবিলে যখন বসলো, মুখের দু'জায়গায় রক্তাক্ত দু'টো ক্ষুদে টয়লেট পেপারের ভগ্নাংশ লেগে রয়েছে।

কাগজ পড়ার ফাঁকে ওপেন স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে রানা। লণ্ডন টাইমস আর নরওয়েজিয়ান অ্যাকটেনপোস্টের দু'টো পত্রিকাই জুলাই মাসের নয় তারিখের দেখে থমকে গেলো ও। স্যাণ্ডউইচে কামড় দিতে গিয়েও হাতটা নামিয়ে আনলো প্লেটে। মাসুদ রানা হিসেবে শেষ যে কথাটা মনে আছে ওর সেটা হলো: জুলাইয়ের এক তারিখে তাতিনাকে নিয়ে বিছানায় উঠেছিলো ও, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছিলো মাঝরাতের ঠিক পরপরই—মাঝরাতের পর হলে তারিখটা হবে দুসরা জুলাই।

মাঝখান থেকে পুরো একটা হপ্তা গায়েব হয়ে গেলো কি করে? স্মৃতি ভ্রংশ? উঁহু। নিজেকে তো চিনতেই পারতো না তাহলে।

হাতের স্টিকিং প্লাস্টারটা অপর হাত দিয়ে স্পর্শ করলো রানা। ওর শরীরটাকে নিয়ে কে যেন কি করেছে। কে এবং কেন জানে না ও, কিন্তু তাকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছে ও। যেই হোক সে, এর জন্যে তাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। দাড়ি কামাবার সময় মুখের বাঁ পাশের দাগটা কাছ থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে ও। অনেক

পুরানো ক্ষত, কিন্তু আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলে ঠিক শুকনো ঘা বলে অনুভব করা যায় না। অথচ, খুব জোরে ঘষা দিয়েও দেখেছে, চামড়া থেকে সেটা উঠেও আসে না। তার মানে, মেক আপের কোনো বাহাদুরি নয় ব্যাপারটা। ডান চোয়ালের জন্মদাগটাও তাই।

ওর নাক, দু'দিকের গাল এবং দু'ভাগে ভাগ করা থুতনির মধ্যেও কিরকম যেন একটা গোলমাল আছে ছুঁলে রাবারের মতো লাগে। শরীরে কখনো অতিরিক্ত মেদ জমেনি ওর, তাই ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা স্বাভাবিক কিনা।

আরেকটা ব্যাপার আবিষ্কার করলো রানা। ফিলাতভের মুখে কিছু চুল গজিয়েছিলো, যেগুলো কামিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু কপালের উপরের টাকটা দারুণ মসৃণ। তার মানে চুলের রেখা যেই উপর দিকে সরিয়ে নিয়ে যাক, কাজটা সে ব্লেডের সাহায্যে করেনি। করেছে অন্য কোনো কৌশলে।

ফিলাতভের মুখে শুধু একটা জিনিসই দেখতে পাচ্ছে রানা যা ফিলাতভের নয়, ওর নিজের। চোখ দু'টো একটুও বদলায়নি। প্রতিদিন সকালে ঠিক যেমন সাদা জমির উপর কালো দু'টো মণিকে দেখে রানা, এখনো তেমনি দেখতে পাচ্ছে। তবে, চোখের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে, তার কারণ বাঁ দিকের চোখের পাতাটা নিচের দিকে একটু যেন ঝুলে আছে। ওই চোখটার বাইরের কোণে একটা জ্বালা জ্বালা ভাব অনুভব করছে ও। কি একটা সন্দেহ জেগে উঠলো মনে, কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলো এক কণা চামড়া উঠে গেছে ; এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা তেমন কিছু নেই।

কফির কাপে চুমুক দেবার ফাঁকে দ্য টাইমসে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে রানা। পৃথিবীটা এখনো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে, ওদিকে

কোনো ঘাপলা দেখা দেয়নি। রাজনৈতিক কলহ ধুমসে চলছে। নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রাশিয়া আমেরিকাকে, আমেরিকা রাশিয়াকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে আগের মতোই। কাগজটা একপাশে সরিয়ে রাখলো রানা। মানব সভ্যতার প্রতি কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করলো হঠাৎ। কেন যেন মনে হলো এতো কষ্টের, এতো সাধের এই সভ্যতা বড় বেশি ঠুনকো, যে কোনো মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে ধসে পড়তে পারে।

দীর্ঘ একটা চুমুক দিলো রানা ধূমায়িত কফির কাপে। একটা সিগারেট ধরালো। ধূঁয়োটা বিস্বাদ লাগলো মুখে। আবার মনে পড়লো পাইপ খায় ও। কিন্তু কোন্ ব্র্যাণ্ডের টোবাকো খায়, অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না। তবে, সেটার গন্ধ এবং স্বাদ কেমন তা কল্পনা করতে পারছে।

ভাবছে রানা। তেলআবিবের একজন ঘুমন্ত লোককে বিছানা থেকে তুলে, তার চেহারা বদলে দিয়ে, স্মৃতি কেড়ে নিয়ে, তাকে নরওয়ের একটা বিলাসবহুল হোটেলে নিয়ে এসে ফেলে রেখে কার কি লাভ?

উত্তর জানা নেই।

লাঞ্চ খেয়ে শরীরের ক্লান্তি আর দুর্বলতা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে ও। চুপচাপ শুয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। একটা সম্ভাবনা উঁকি দিলো মনে। সে কি খুব ব্যস্ত মানুষ ছিলো? সারাক্ষণ দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকতো? তা নাহলে কিছু একটা করার, কোথাও যাবার একটা তাগাদা অনুভব করছে কেন ভেতর থেকে? ইহুদি ও, ইসরায়েলি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই—এটুকু পরিষ্কার। কিন্তু,

পেশাটা কি ওর ?

বাইরে বেরুবার কথা ভাবতে গিয়েই মনটা কুঁকড়ে গেলো। এখুনি লোকজনের সামনে যেতে চায় না ও। আরো কিছু সময় দরকার। কিছু ঘটে কিনা দেখা যাক। হয়তো কিছু কিছু স্মৃতি ফিরে আসতে পারে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপোস করলো রানা। বাইরে এখন যাবে না। তার চেয়ে ফিলাতভের জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখা যাক কোনো সূত্র পাওয়া যায় কিনা।

ওয়ারড্রোবটা খুললো রানা। ভিতরের একটা দেরাজ টেনে বের করলো। এক গাদা আণ্ডারওয়্যার, তার নিচে বড়সড় একটা ট্রাভেলিং ওয়ালেট দেখলো। ড্রেসিং টেবিলের কাছে নিয়ে এসে সেটার চেন খুললো।

প্রথমেই চোখে পড়লো একটা ইসরায়েলী পাসপোর্ট। খুললো সেটা। ওর নিজের হাতের লেখা চিনতে পারলো রানা। পাসপোর্ট হোল্ডারের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য লেখা রয়েছে। অপর পৃষ্ঠায় ছবির নিচে ওর হাতেই ফিলাতভের নাম সই করা। সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ফিলাতভকে। গোটা কীর্তিটা যারই হোক, নিখুঁতভাবে কাজটা করেছে সে, কোথাও কোনো ফাঁক ফোঁকর রাখেনি।

পাসপোর্টের পাতা ওল্টাতে শুরু করলো রানা। মাত্র এক জায়গায় এন্ট্রির স্ট্যাম্প লাগানো রয়েছে। ভুরু কুঁচকে উঠলো ওর জায়গাটার নাম পড়তে গিয়ে। Sverige? সুইডেনে নাকি? তা যদি হয়, তাহলে সুইডেনের আরলানডা নামে এক জায়গায় গিয়েছিলো ও—কিন্তু কবে, কোন্ মাসের কতো তারিখে, বোঝা যাচ্ছে

না। তারিখ লেখা জায়গাটায় সীল পড়ে সব ঢেকে দিয়েছে। পাস-পোর্টের পেছন দিকে লেখা রয়েছে, মাসখানেক আগে সাড়ে চার হাজার পাউণ্ড ইস্যু করা হয়েছে ওর নামে। কিন্তু ট্র্যাভেল অ্যালা-উন্স হিসেবে কাউকে নয়শো পাউণ্ডের বেশি দেয়া হয় না। তার মানে, ফিলাতভ বিজনেসম্যানস অ্যালাউন্সের অতিরিক্ত সুবিধে-টুকু পুরোমাত্রায় ভোগ করছে।

ওয়ালেটের সবচেয়ে নিচের পকেটে একটা আমেরিকান এক্স-প্রেস ক্রেডিট কার্ড পেলো রানা। আঙ্গুল দিয়ে নাড়ছে পাতাগুলো। এটা দিয়ে যে-কোনো জায়গা থেকে টাকা তুলতে পারে ও, ইচ্ছা করলে ইসরায়েলে যাবার একটা বিমানের টিকেট কিনতে পারে। ওর বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগ যদি না করে থাকে, এটার সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় যেতে পারবে সে, ভোগ করতে পারবে ভ্রমণের অবাধ স্বাধীনতা।

মানিব্যাগ আর ড্রাইভিং লাইসেন্সের সাথে ওয়ালেটটা রেখে দিলো রানা। প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশি কাজ দেবে এটা।

ফিলাতভের ওয়ারড্রোবে একগাদা পোশাক দেখলো রানা। লাউঞ্জ স্যুট, ডিনার জ্যাকেট দু'জোড়া করে। ছোট্ট একটা বাক্স পেলো। তাতে ব্যক্তিগত কিছু মূল্যবান জিনিস। সোনার বোতাম, টাই-পিন, একজোড়া আংটি। ওজন অনুভব করে বুঝলো, হাজার তিনেক পাউণ্ডের সোনা রয়েছে ওর হাতে। হাতের ঘড়ি পাটেক ফিলিপির দামও হাজার পাউণ্ডের কম হবে না। ফিলাতভ ধনী লোক, কোন্ শ্রেণীর সিভিল সার্ভেন্ট সে তাহলে?

পোশাক পরার সিদ্ধান্ত নিলো রানা। রোদ ঝলমলে দিন, তাই স্যুট পরবে না। সাধারণ একটা ট্রাউজার আর একটা স্পোর্টস

কোট পরলো ও। শরীরের কাঠামোর সাথে খাপে খাপে মিলে গেলো দু'টোই, যেন ওর জন্যেই তৈরি করে রাখা হয়েছে। ওয়ার-ড্রোবের দরজায় লাগানো প্রমাণ সাইজের আয়নায় নিজেকে দেখলো রানা। কাঁধের উপর বসানো মুখটাকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলো ও। মুখটা যেন আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব, ওর সাথে সদ্ভাব নেই, বলতে গেলে একরকম শত্রুই। কিন্তু না তাকালেও কল্পনা করতে গিয়ে বুঝতে পারলো মুখটা ওকে ব্যঙ্গ করছে, নিঃশব্দে ভেঙচাচ্ছে। 'শালা!' দাঁতে দাঁত ঘষে গালি দিলো রানা।

মাথাটা আবার ঘুরতে শুরু করলো। তবে হাঁটুর নিচের পুরনো ক্ষত চিহ্নটার কথা মনে পড়ে গেলো সাথে সাথে, দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে পারলো রানা।

ব্যক্তিগত জিনিসগুলো পকেটে ভরে নিলো রানা। দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। ভাবছে। দরজার ওপারে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জগৎ। বেরুবে?

সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দৃঢ় পায়ে এগোলো রানা। হাতে চাবির গোছা।

দরজার কবাট দু'টো উন্মুক্ত হতেই বাইরের দরজার হাতলের সাথে আটকে থাকা একটা কার্ড পড়ে গেলো মেঝেতে। ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে লেখাটা পড়লো রানা।

VENNLIST IKKE FORSTYRR--PLEASE DO NOT DISTURB.

দরজাটা বন্ধ করার আগে ভিতর দিকের হুকে কার্ডটা ঝুলিয়ে রাখলো রানা। কার কাজ এটা জানার জন্যে পকেটের সব টাকা খরচ করতেও আপত্তি নেই ওর।

এলিভেটরে ওর সাথে চড়লো দু'জন আমেরিকান প্রৌঢ়া। কান ঝালাপালা করে ছাড়লো। এতো বেশি কথা বলছে যে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে কথা বলতে গিয়ে। 'ভিজিল্যাণ্ড পার্কে গেছো? কতো স্ট্যাচু, কোন্‌টা যে দেখবো ভেবে পাই না!' এলিভেটর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে থামতে মৃদু হিস্‌স্‌ শব্দে খুলে গেলো দরজা, রানাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলো দুই প্রৌঢ়া। শহরের দর্শনীয় কিছু দেখতে যাচ্ছে ওরা ঈর্ষা হলো রানার। নিজেদের সম্পর্কে ওদের কোনো সংশয় নেই, সন্দেহ নেই। অতীতের সব কথা মনে আছে ওদের নিজেদের সম্পর্কে কিছু অজানা নেই। ভিতরে-বাইরে ওরা কেউ ওর মতো আলাদা নয়।

ধীর পায়ে এগোচ্ছে রানা। লবিতে পৌঁছে থামলো। কোন দিকে যাবে, কি করবে, ভাবছে। স্বাভাবিকভাবে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

'মিঃ ফিলাতভ মিঃ ফিলাতভ, স্যার!'

স্বাভাবিক ভাবে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো রানা। ডেস্কের পেছনে ইউনিফর্ম পরা পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে

শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট দু'টো একটু ভাঁজ করে মুখের ভিতর নিয়ে জিভ ঠেকিয়ে ভিজিয়ে নিলো রানা। এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়ালো। 'বলো

'দয়া করে এখানে একটা সই দেবেন, স্যার? আপনার রুমে খাবার পাঠানোর চেক। কিছু না, স্রেফ ফরমালিটি।'

পোর্টারের হাতে কলম। চাবির গোছাটা ডেস্কে নামিয়ে রেখে সেটা নিলো রানা। ছোট্ট কাগজের স্লিপে কলমের চাপ দিয়ে লিখলো, 'এ. পি. ফিলাতভ।'

ওর দিকে পেছন ফিরে চাবির গোছাটা তুলে র‍্যাকে রাখছে পোর্টার। রানা কেটে পড়তে যাবে, লোকটা ওকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'নাইট পোর্টার তুলে রেখেছে আপনার গাড়ি, স্যার। এই যে চাবিটা।'

ঘুরে দাঁড়ালো পোর্টার। রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলো গাড়ির চাবি। হাত বাড়ালো রানা। চাবির সাথে ঝুলন্ত একটা প্লাস্টিকের চাকতি, তাতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে Hertz সেই সাথে গাড়ির নাম্বার গলাটা পরিষ্কার করে নিলো রানা, বললো, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সাথে সাথে ভদ্রতাসূচক একটু উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখলো রানা পোর্টারের মুখে। 'আপনার বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে, স্যার।'

প্রশ্ন করার সুযোগটা হাতছাড়া করলো না রানা। 'কেন মনে হচ্ছে কথাটা তোমার?'

'গলাটা কেমন অচেনা লাগছে কানে, স্যার।'

'ঠিক বলেছো। জাম হয়ে আছে বুকটা। গলা বসে গেছে।'

হাসলো পোর্টার। 'খুব বেশি রাতের বাতাস লেগে এমন হয়েছে।'

আরেকটা সুযোগ নিলো রানা। 'গত রাতে ক'টায় ফিরে-ছিলাম বলো তো?'

'ভোরের দিকে, স্যার। নাইট পোর্টার বললো আপনি তিনটের দিকে ফিরেছেন।' সবজান্তার ভঙ্গিতে হাসলো পোর্টার। 'এতো বেলা করে ঘুমাচ্ছেন দেখে তাই আমি অবাক হইনি।'

না। ভাবলো রানা। কিন্তু নাইট পোর্টার যা দেখেছে তাও সত্যি হতে বাধ্য। ভুল দেখবে কেন সে? মিথ্যেই বা বলবে কেন? যাই হোক এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য। আত্মবিশ্বাস বাড়ছে ওর।

'আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারো আমাকে? এক বন্ধু জানতে চাই-ছিলো অসলোয় কদ্দিন ধরে আছি—কিন্তু, এমন ভুলো মন আমার, কোনমতেই মনে করতে পারলাম না ঠিক কোন্ দিন এই হোটেলে উঠেছি। খাতা দেখে তারিখটা জানাতে পারো আমাকে?'

'অবশ্যই স্যার', রানার দিকে পেছন ফিরলো পোর্টার। একটা ফাইল টেনে নিয়ে কার্ডগুলোয় চোখ বুলাতে শুরু করলো।

এই ফাঁকে গাড়ির চাবিটা দেখছে রানা। Hertz কোম্পানিকে ধন্যবাদ, ভাবছে ও, চাবির সাথে গাড়ির নাম্বারটা রেখেছে তারা। গাড়িটাকে খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধে পোহাতে হবে না ওকে। নাইট পোর্টারেরও একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য, গাড়িটা তুলে রেখেছে সে। কিন্তু তুলে রেখেছে কোন্ চুলোয়?

ওর দিকে ফিরলো পোর্টার। 'জুনের আঠারো তারিখে, স্যার। ঠিক তিন হপ্তা আগে।'

তলপেটের ভিতরে একটা আলোড়ন অনুভব করলো রানা।

'থ্যাঙ্ক ইউ', নিজের কানেই বেসুরো শোনালো শব্দটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটছে। একটা তীরচিহ্ন আঁকা সাইনবোর্ড দেখলো, বার-এর দিক নির্দেশ করছে। বাঁ পাশে তাকিয়ে ছায়ায় ঢাকা ঠাণ্ডা একটা নিচু চাতাল দেখলো রানা। মাথাটা নক্সা করা কাঠের তক্তা দিয়ে ছাওয়া। কয়েকজন লোক বসে পান করছে, বেশির ভাগই একা, দু'এক জোড়া জুটিও রয়েছে। বেশ শান্ত পরিবেশ। ওখানে বসে চিন্তা করা যেতে পারে।

একটা টেবিল দখল করে বসলো রানা। একটু পরই এলো এক-জন বেয়ারা। 'একটা বিয়ার, প্লিজ', অর্ডার দিলো ও।

'এক্সপোর্ট কোয়ালিটি, স্যার?'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকালো রানা। জুনের আঠারো তারিখ এর আগে আবিষ্কার করেছে ও, তেল আবিবে ঘুমিয়ে পড়ার পর থেকে এই অসলোয় ঘুম ভাঙার মাঝখানে একটা হপ্তা হারিয়েছে ও, তাহলে অসলোর এই হোটেলে তিন হপ্তা আগে কিভাবে উঠলো? একই স'য় দু'জায়গায় কিভাবে ছিলো ও?

বেয়ারা ফিরে এসে বোতল থেকে গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিয়ে চলে গেলো। জুনের আঠারো তারিখে কোথায় ছিলো, শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারছে না। দীর্ঘ একটা সময়। জুন মাসের আঠারো তারিখে সন্ধ্যা ছ'টা সতেরো মিনিটে কোথায় তুমি ছিলে? তিন হপ্তা কেটে যাবার পর এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ নয়। সেজন্যে অ্যালিবাই দাঁড় করাতে হিমশিম খেতে হয় লোককে। ওর ব্যাপারটা অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। দুর্বল স্মরণশক্তির শিকার নয় ও ওর ব্যাধিটা আরো সাংঘাতিক: স্মৃতির পাতার আঁচড়টি পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই, সব ধবধবে সাদা, শূন্য হয়ে গেছে।

আবছাভাবে কি যেন একটা মনে পড়তে চাইছে। সতেরো··· ১৮···একটা বন্দর···গলফ কোর্স···বিকেল বেলায়—হঠাৎ উজ্জ্বল আলোর ঝলকের মতো মনে পড়ে গেলো ব্যাপারটা। হ্যাঁ, সতেরো এবং আঠারো তারিখে হাইফায় ছিলো ও। আঠারো তারিখে বিকেল বেলা গলফ খেলেছে···কার সাথে? কি আশ্চর্য, তা মনে নেই। সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিলো, রাত করে হোটেল আকুরায় ডিনার খেয়েছে।

তার মানে? মাসুদ রানা হিসেবে ইসরায়েলের বন্দর শহর হাইফার হোটেল আকুরায় যে-সময় ডিনার খেয়েছে ও, ঠিক সেই সময় আনাতোলি প, ফিলাতভ হিসেবে ডিনার খেয়েছে নরওয়ের

অসলোর হোটেল কন্টিনেন্টালে। কি করে হয় তা?

হলুদ বুদ বুদ উঠছে গ্লাসে, একদৃষ্টিতে তাই দেখছে রানা। হঠাৎ খেয়াল হতে গ্লাসটা তুলে নিয়ে এই প্রথম চুমুক দিলো। ঠাণ্ডা একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেলো শরীরটা।

ওকে সমর্থন করছে দু'টো মাত্র ব্যাপার, এ দু'টোর সমর্থন না পেলে এতক্ষণ উন্মাদ হয়ে যেতো ও। এক, আনাতোলি প. ফিলাতভের হাঁটুর নিচে মাসুদ রানার ক্ষতচিহ্ন। দুই, কণ্ঠস্বরটা ফিলাতভের নয়—এ ব্যাপারে পোর্টারও নিজের অজ্ঞাতে সাক্ষ্য দিয়েছে। এসব থেকে আসল ব্যাপার কি বেরিয়ে আসছে?

কোনো সন্দেহ নেই, এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ফিলাতভ একজন নয়, দু'জন। একজন জুনের ১৮ তারিখে এই হোটেলে উঠেছে, আরেকজন—ও নিজে—যাকে স্রেফ এখানে নিয়ে এসে রেখে যাওয়া হয়েছে। কিভাবে বা কেন, এসব প্রশ্ন এখন থাক, মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই আপাততঃ। ঘটনাটা ঘটেছে, সোজাসুজি এটা মেনে নেয়া যাক।

দু'ঢোক বিয়ার খেয়ে গালে হাত রেখে গম্ভীর তন্ময়তার সাথে ভাবছে রানা। ওর জীবন থেকে একটা হপ্তা খসে গেছে। এতটা প্লাস্টিক সার্জারী কি এই এক হপ্তায় করা সম্ভব? খোঁজ খবর নিতে হবে যে-সব ব্যাপারে, তার মধ্যে এটাও একটা—নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো ও।

এখন করণীয় কি? নিজের দেশের দুতাবাসে যেতে পারে ও, গিয়ে ওদেরকে সব কথা খুলে বলতে পারে। কিন্তু ইসরায়েলি দুতাবাস কোথায় তা জানা নেই ওর।

তবু, দুতাবাসে গেলে কি ঘটতে পারে, মনে মনে কল্পনা করার

চেষ্টা করলো রানা।

'আপনার জন্যে আমরা কি করতে পারি, মিঃ ফিলাতভ?'

'দেখুন, আমি ঠিক ফিলাতভ নই—কে সে, আমি তা জানিও না। আমার নাম মাসুদ রানা, আমাকে তেল আবিব থেকে কিড-ন্যাপ করা হয়েছে। আমার চেহারা বদলে আমাকে অসলোর হোটেল কন্টিনেন্টালে ফেলে রাখা হয়েছে, সাথে প্রচুর টাকা, এবং আনলিমি-টেড ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট। আমাকে আপনারা সাহায্য করতে পারেন?'

'খুব পারি, মিঃ ফিলাতভ। ওহে, এক্ষুণি ডাক্তারকে খবর পাঠাও। বলো, একটা বদ্ধ পাগলের চিকিৎসা করতে হবে...'

এরপর কি ঘটবে সহজেই অনুমান করতে পারলো রানা। ধরে-বেঁধে ওকে ভরা হবে পাগলাগারদে। 'মাই গড!' আঁতকে উঠলো ও।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো বেয়ারা। এগিয়ে এলো রানার দিকে। 'কিছু চাইছিলেন, স্যার?'

'বিল দাও।' শেষ চুমুক দিয়ে বিয়ারের গ্লাসটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখলো রানা টেবিলে। পকেট থেকে এক গাদা খুচরো পয়সা বের করে টেবিলে রেখে বেয়ারার দিকে তাকালো, 'তুলে নাও।'

একটু ইতস্তত করে কয়েকটা চাঁদির মুদ্রা তুলে নিলো বেয়ারা। নিঃশব্দে একটা হাঁফ ছাড়লো রানা। টেবিলে এখনো অনেক পয়সা। 'তোমার বকশিশ,' মুচকি হেসে বললো ও, 'যা ইচ্ছা মুঠোয় ভরো।'

সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে বড়লোকি কৌতুক মনে করে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে হাসছে বেয়ারা মাঝারি আকারের একটা মুদ্রা তুলে নিলো সে। মাথা নিচু করে বো করলো রানাকে।

বাকি খুচরোগুলো পকেটে ভরে বার থেকে বেরিয়ে এলো রানা। লবিতে গ্যারেজ লেখা একটা সাইন দেখে বাঁক নিলো, দরজা টপকে বেরিয়ে এসে একটা সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামলো। সেখান থেকে বেসমেন্টের কার পার্কে। প্রথম সারির গাড়িগুলোর সামনে দিয়ে নাম্বার দেখতে দেখতে এগোচ্ছে। পোর্টারের দেয়া হার্জ কী-এর নাম্বারের সাথে সারির সব শেষ গাড়িটার নাম্বার মিলে গেলো। ওরেব্বাস! এ যে মস্ত এক কালো মার্সিডিজ।

দরজার তালা খুললো রানা। প্রথমেই চোখে পড়লো, ড্রাইভারের সীটে একটা পুতুল। আনাড়ি হাতে কাঠ আর দড়ি দিয়ে তৈরি করা অদ্ভুত এক বস্তু। এক খণ্ড দড়িকে যতবার দরকার পাক খাইয়ে গড়া হয়েছে পুতুলের শরীরটা, শেষ প্রান্তটা বেরিয়ে এসেছে লেজের চেহারা নিয়ে। পা ছ'টো না থাকলেই নয় তাই আছে, আর মাথাটা ঠিক যেন একটা গোল পেয়ারা, তাতে বড়শির মতো একটা নাক। চোখ ছ'টো আর মুখটা মোচড় খেয়ে সরে আছে একদিকে, কাঠের উপর কালি ঢেলে রঙ করা হয়েছে। ছ'টো বেণী তৈরি করা হয়েছে দড়ির অপর প্রান্তটাকে ছ'ভাগে ভাগ করে। ছোট্ট পুতুলটার মধ্যে কেমন একটা বিদঘুটে, কদর্য ভাব আছে, লক্ষ্য করলো রানা।

হাত বাড়িয়ে পুতুলটা তুলতেই নিচের চিরকূটটা দেখতে পেলো ও। কাগজের ছোট্ট একটা টুকরো। ভাঁজ করা। টুকরোটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুললো ও। দ্রুত হাতে, আঁকা-বাঁকা ইংরেজি অক্ষরে ছ'টো বাক্য লেখা: তোমার ড্রামেন ডলি তোমার জন্যে স্পাইরালটোপেনে অপেক্ষা করছে। ১০ই জুলাইয়ের ভোর বেলা।

ভুরু কুঁচকে উঠলো। আগামীকালই দশ তারিখ। কিন্তু এই চিরকূটের মানে কি? স্পাইরালটোপেন, কোথায় জায়গাটা? ড্রামেন

ডলিই বা কি—বা কে ? কুৎসিত পুতুলটার দিকে তাকালো রানা। ড্রাইভিং সীটে পড়ে ছিলো এটা, এর মানে ও যাতে দেখতে পায় তার জন্যে ইচ্ছে করেই রেখে গেছে কেউ। কয়েকবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি করলো পুতুলটাকে, তারপর পকেটে ভরে রাখলো। উঁচু হয়ে থাকলো পকেটটা। চোখে পড়ার মতো। কিছু এসে যায় না। চিরকুটটাকে তুলে রাখলো ওয়ালেটে।

একেবারে নতুনই বলা চলে গাড়িটাকে, মাত্র পাঁচশো কিলো-মিটার গড়িয়েছে। গ্লোভ কম্পার্টমেণ্টে কিছু কাগজপত্র পেলো ও, হার্জ কোম্পানির কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া করার চুক্তিপত্র। পাঁচদিন আগে ভাড়া করা হয়েছে মার্সিডিজ।

বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়ির দরজায় তালা লাগালো রানা। গাড়ি বের করার পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এলো হোটেলের পেছন দিকের রাস্তায়।

একটু বিস্ময়কর ঠেকলো, রাস্তার উল্টো পাশ ধরে যানবাহন চলাচল করছে। রাস্তার পাশে এবং দোকানগুলোর মাথায় সব সাইনবোর্ড নরওয়েজিয়ান ভাষায় লেখা। মাতৃভাষা বাংলা, বা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজির নাম-নিশানা কোথাও দেখতে পাচ্ছে না রানা।

ফুটপাত ধরে হাঁটছে ও। একটা বুকস্টলের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তথ্য দরকার। হঠাৎ থামলো ও। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। পাওয়া গেছে বুকস্টল।

দোকানটা থেকে একটা সেণ্ট্রাল অসলোর, একটা গ্রেটার অস-লোর আর একটা মটরিং রুট অব সাউদার্ন নরওয়ের ম্যাপ, এবং একটা সিটি গাইড বুক কিনলো ও। ফিলাতভের ওয়ালেট থেকে

নরওয়েজিয়ান একটা কাগজের নোট বের করে দিলো দোকানদারকে। লোকটা তার প্রাপ্য রেখে ভাঙতি টাকা ফেরত দিলো। সুযোগ পেলেই কতো টাকা আছে ওয়ালেটে গুণে দেখতে হবে, ভাবলো রানা। বুকস্টল থেকে বেরিয়ে পাশের টোবাকোর দোকানে ঢুকলো ও। কড়কড়ে নতুন আরেকটা নোট ভাঙিয়ে একটা ব্রায়ার টোবাকো পাইপ এবং এক কৌটা ক্যাপস্টান পাইপ টোবাকো কিনলো।

হোটেলে ফিরতে চাইছে এখন। ম্যাপ দেখে নিজের অবস্থান, চারপাশের জগৎ ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা ধারণা পেতে হবে ওকে। বাঁকের কাছে পৌঁছে থামলো। রাস্তার নাম লেখা একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়েছে—সম্ভবত বিদেশীদের স্বার্থেই ইংরেজী অক্ষরে লেখা হয়েছে নামটা, রোয়াল্ড অ্যামুণ্ডসনস্ গাটা।

'আন্তন!'

বাঁক ঘুরে এগোচ্ছে রানা, কিন্তু কাঁধে হাত পড়তে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে। ঝট্ করে তাকালো পেছনে।

'আন্তন ফিলাতভ!' দুঃখ, রাগ আর ক্ষোভ একসাথে প্রকাশ পাচ্ছে মেয়েটার গলার সুরে।

ঢোক গিললো রানা। রূপ নয়, যেন আগুন। মাথায় লালচে ঝুঁটি। চোখ দু'টো গভীর সবুজ। রানার চেয়ে একটু কম হবে লম্বায়। কোমরটা চিকন, কিন্তু গুরু নিতম্ব। ট্রাউজারে গোঁজা সাদা ফুলহাতা শার্টের ভিতর থেকে সুগঠিত বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। লালচে পাকা আপেলের মতো ফোলা দু'গালের মাঝখানে সুন্দর একটা নাক। সব মিলিয়ে অপরূপ সুন্দর। আরেকবার ঢোক গিললো রানা। কিন্তু মুখ খুলতে গিয়ে অনুভব করলো, ভাঁড়ারে কোনো শব্দ নেই।

'সারাটা সকাল তোমার জন্যে ঠায় আমি একপায়ে দাঁড়িয়ে।' রানার হাত ধরে ঝাঁকি দিলো মেয়েটা।' 'কি হয়েছে তোমার? কোথায় ছিলে তুমি?'

'হোটেলেই তো ছিলাম', মৃদু গলায় বললো রানা। খক্ খক্ করে দু'বার কাশলো। 'শরীরটা ভালো ছিলো না। বিছানায় শুয়ে ছিলাম।'

'টেলিফোন নামে একটা যন্ত্র আছে'. লাল চুল ভর্তি মাথা আর রাগে লাল মুখটা রানার চোখের একেবারে সামনে সরিয়ে আনলো মেয়েটা। 'আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল আবিষ্কার করেছেন সেটা— মনে পড়ে?'

যা করা উচিত বলে মনে হবে তাই করে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। মেয়েটার কথায় একটু হাসলো ও। কিন্তু পরমুহূর্তে একটা ক্লান্ত ভাব ফুটিয়ে তুললো মুখের চেহারায়। 'ঘুমের জন্যে স্লিপিং পিল খেতে হয়েছিলো', প্রতিবাদের সুরে বললো ও। 'সম্ভবত ওভারডোজ···

মুহূর্তে বদলে গেলো মেয়েটা। উদ্বেগের ছায়া ফুটলো মুখে। ভালো করে দেখলো রানাকে। 'শরীর খারাপ, সত্যি?'

ক্লান্তভাবে হাসলো রানা। 'সত্যি।'

'তাহলে হয়তো ক্ষমা করা যেতে পারে তোমাকে,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বললো মেয়েটা। 'কিন্তু ক্ষতিপূরণ না দিয়ে পার পাবে তা ভেবো না। ড্রিঙ্কের বিলটা তোমাকেই দিতে হবে।' রানার হাতটা বগলদাবা করে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে চললো সে।

হোটেলের দিকে নয়, অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা ওকে, বুঝতে পেরে একটা অস্বস্তি বোধ করলো রানা। অপরিচিত একটা মেয়ের সাথে অপরিচিত কোনো জায়গায় যেতে মন চাইছে না।

বললো, 'হোটেলে গেলে হয় না?'

শুনেই দাঁড়িয়ে পড়লো মেয়েটা। রানার দিকে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে তাকালো। চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্রয়, মুখে কৃত্রিম তিরস্কারের ভাব। 'রোজ রোজ কি পেয়েছো তুমি, শুনি? আমাকে দেখলেই বুঝি ইচ্ছা হয় তোমার?'

'কি ইচ্ছা হয়?' প্রশ্নটা করেই অনুভব করলো রানা, বোধহয় বোকামি করে ফেলেছে ও।

'ন্যাকামি হচ্ছে, না? কি ইচ্ছা হয় জানো না? ভিজে বিড়াল? বাই গড, এভাবে যদি রোজ একবার করে রেপ করো...'

আগেই একটু বুঝেছিলো। এবার পুরোপুরি চোখ খুলে গেলো রানার। যাই হোক, ফিলাতভের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে একটু একটু করে জ্ঞান বাড়ছে ওর। বললো 'ঠিক আছে, তোমার যেখানে খুশি, চলো।'

'যেখানে খুশি মানে?' ভুরু কুঁচকে তাকালো মেয়েটা। সর্বনাশ, কি ভুল করে ফেললাম কে জানে—ভাবলো রানা। 'তোমার সাথে স্টুডেন্টারলাণ্ডেনে ছাড়া কবে কোথায় গেছি আর? ওঃ, বুঝেছি, সাহেব ঝাল দেখাচ্ছেন, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে, গলাটা ভিজিয়ে আগে গা গরম করে নিই এসো, তারপর তোমার মনের খিদে মেটানো যায় কিনা ভেবে দেখা যাবে'খন।' একটা চোখ টিপলো মেয়েটা। 'এই না বললে তোমার শরীর খারাপ। পুরুষ জাতটা না...!' অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করলো সে। ফুটপাত থেকে টেনে নামালো রানাকে। হাত দেখিয়ে একটা বাসকে দাঁড় করালো। রাস্তা পেরোচ্ছে ওরা।

ফাঁদে আটকে পড়েছে, সেজন্যে একটা অস্বস্তি বোধ করছে

রানা। কিন্তু সেই সাথে এটাও বুঝতে পারছে, ফিলাতভ সম্পর্কে কিছু যদি জানতে চায়, এমন সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না।

রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাতে উঠলো ওরা।

'জ্যাক জাস্টিসের সাথে আজ সকালে দেখা হয়েছে', বললো মেয়েটা। 'তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো।'

'কেমন আছে সে?'

হাসলো মেয়েটা। 'সদা প্রফুল্ল। কেমন লোক জানোই তো!'

'জানি বৈকি,' ফ্যাকাসে মুখে বললো রানা। 'গুড ওল্ড জ্যাক।'

একটা আউটডোর কাফেতে ঢুকলো ওরা। খানিক অপেক্ষা করার পর একটা খালি টেবিল জুটলো কপালে। চারদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা মেয়েকেও পাশের মেয়েটার মতো সুন্দরী মনে হচ্ছে না রানার। ছাত্ররা ঈর্ষাকাতর চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে, দেখেও কোনো অনুভূতি হলো না রানার। অন্য সময় হলে করুণা বোধ করতো হয়তো ওদের জন্যে। চেয়ারে বসলো ওরা। হাতের ভাঁজ করা ম্যাপগুলো টেবিলে রাখলো রানা। নখ পালিশ লাগানো তর্জনী তুললো মেয়েটা সেগুলোর দিকে। 'কি ওগুলো?'

একটু ইতস্তত করলো রানা। 'ম্যাপ।'

'কোথাকার ম্যাপ?'

'শহরের।'

'অসলোর!' কৌতুকে নেচে উঠলো মেয়েটার চোখ। 'অসলোর ম্যাপ দিয়ে কি দরকার তোমার? তুমিই না গর্ব করে বলো, তেল আবিবের চেয়ে অসলোকে বেশি ভালো করে চেনো?'

'এগুলো একজন বন্ধুর জন্যে।'

ফিলাতভের অত্যন্ত পরিচিত শহর অসলো, ভাবছে রানা, সম্ভবত প্রায়ই এখানে আসা-যাওয়া করে সে। স্থানীয় পরিস্থিতি এবং হালচাল সম্পর্কে কথা না বলাই ভালো, নিজের অজ্ঞাতে বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

'তাই বলো!' সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেললো মেয়েটা।

প্রতিমুহূর্তে অদ্ভুত একটা অসুবিধের মুখোমুখি হচ্ছে রানা। মেয়েটার নাম জানে না ও। আলাপের সময় নিজের নাম হঠাৎ কেউ উচ্চারণও করে না, সুতরাং নামটা জানার কোনো উপায় নেই। আছে, হঠাৎ আবিষ্কার করলো ও। ওর চোখ পড়েছে মেয়েটার হাতব্যাগে। ওটা হাতড়াবার একটা সুযোগ পেলে শুধু নাম নয়, আরো কিছু হয়তো জানা যেতে পারে।

সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পথ এতো দ্রুত আবিষ্কার করতে পেরে খুশি হয়ে উঠলো রানা, কিন্তু সেই সাথে একটা হাস্যকর সম্ভাবনাও উঁকি দিলো মনে। এতো থাকতে হঠাৎ হাতব্যাগ হাতড়াবার ইচ্ছাটা জাগলো কেন? পকেটমারদের স্বভাব এটা। তবে কি··· নাহ্। সম্ভাবনাটা সাথে সাথে দূর করে দিলো রানা। এতটা আজেবাজে লোক হতে পারে না ও, অন্তত মন স্বীকার করছে না কথাটা। তাছাড়া, সাধারণ একজন পকেটমারের চেহারা বদলে কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা কোনো পাগলও করবে না। চেহারা বদল করা থেকেই প্রমাণ হয়, কোনো না কোনো লাইনে প্রথম সারির সেরা লোক ছিলো ও। তা নাহলে ওকে বেছে নেয়া হতো না।

'একটা সিগারেট দাও তো, ডারলিং।'

ঠিক এই প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিলো রানা। 'দুঃখিত। সিগারেট সাথে নেই।'

'কি।' বিষম খেলো মেয়েটা। 'তোমার সাথে সিগারেট নেই? তোমার হাতের পাঁচটা আঙুলই নেই, একথা শুনেও এতটা আশ্চর্য হবে না কেউ। মানেটা কি? প্রফেসর ফিলাতভ কি তাহলে ধূমপান ছেড়ে দিলো? এখন আর ক্যান্সারে বিশ্বাস না করে উপায় নেই আমার।'

প্রফেসর!

আবার অসুস্থতার অজুহাত তুললো রানা। 'ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি তা ঠিক নয়। শরীরটা খারাপ, তাই সিগারেট বিস্বাদ লাগছিলো। আমি…'

'সিগারেট ছাড়া ফিলাতভ, ইফেল টাওয়ার ছাড়া প্যারিস—কল্পনায় আসে না।'

একটা মেয়ে ওয়েটার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গিনীর দিকে চোখ তুললো রানা। 'তোমার জন্যে কি?'

'যা সব সময় দেয়', হাতব্যাগ হাতড়াচ্ছে মেয়েটা।

রুমাল বের করে মুখের কাছে তুললো রানা। কাশছে। ওর সঙ্গিনীর কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে মেয়ে ওয়েটার সরে না যাওয়া পর্যন্ত কাশিটা চালিয়ে গেলো সে।

'কাশিটা ভালো মনে হচ্ছে না, আন্তন। ক্যান্সার কাঠি ত্যাগ করে ভালোই করেছো।'

'কাঠির বদলে বাঁশ ধরেছি,' বললো রানা। পকেট থেকে পাইপ আর টোবাকো বের করে রাখলো টেবিলে। 'সিগারেটে স্বাদ পাচ্ছি না বলে এগুলো কিনলাম। দেখা যাক।'

'ওরে বজ্জাত!' হাসছে মেয়েটা। 'তোমার সবকিছুতে প্রফেসরি ফলানো চাই, না?'

পাইপে টোবাকো ভরছে রানা। মুখ না তুলেই বললো, 'আমি প্রফেসর এ কথা বারবার উল্লেখ ক'রো না তো।'

ফিলাতভ প্রফেসর, নাকি মেয়েটা ব্যঙ্গ করে তাকে প্রফেসর বলছে, ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, কথাটা বলে তেমন কোনো ঝুঁকি নিয়েছে বলে মনে করছে না রানা। ইসরায়েলিরা প্রফেশন্যাল টাইটেলের ব্যবহার মাত্রা ছাড়িয়ে করে না। উত্তরে মেয়েটা এমন কিছু বলতে পারে যা রানার মূল্যবান তথ্য বলে মনে হবে।

'ভুলে যাচ্ছো কেন, কন্টিনেণ্টে রয়েছো তুমি। কন্টিনেণ্টে থাকার সময় কন্টিনেন্টালদের রেওয়াজ মেনে চলতে চেষ্টা করো।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়।' পাইপে আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো রানা।

'তুমি আপাদমস্তক ইসরায়েলি।'

'প্রত্যেক ইসরায়েলির তাই কি হওয়া উচিত নয়?'

'দেশপ্রেম তোমার মধ্যে আজ যে একটু বেশি উথলে উঠছে, ব্যাপার কি?' হাসছে মেয়েটা। কিন্তু রানাকে হাসতে না দেখে গম্ভীর হলো সে। 'আজ কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছো তুমি, আন্তন।'

'পিলের কারসাজি। বারবিচুরেট আমার কখনোই সহ্য হয় না। মাথাটা ধরেছে।'

হাতব্যাগ খুললো মেয়েটা। 'আমার কাছে অ্যাসপিরিন আছে।'

ট্রে নিয়ে ফিরে এলো ওয়েট্রেস। বোতলের দিকে চোখ রেখে বললো রানা, 'বিয়ারের সাথে অ্যাসপিরিন চলে বলে মনে হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যাগটা বন্ধ করলো মেয়েটা। 'প্লিজ ইউরসেলফ।'

বিয়ারের দু'টো বোতল, দু'টো গ্লাস, এক প্যাকেট সিগারেট, ট্রে

থেকে নামিয়ে টেবিলে রাখলো ওয়েট্রেস। দ্রুত দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা বলে অপেক্ষা করে থাকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করলো রানা। বেছে নিয়ে বের করলো একটা একশো ক্রোনারের নোট। দু'টো বিয়ার আর এক প্যাকেট সিগারেটের দাম এর বেশি হবে বলে আশঙ্কা করছে না রানা। মাই গড, ভাবছে ও, এদেশী মুদ্রার মান সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই ওর। চোখ বাঁধা অবস্থায় হেঁটে মাইন বিছানো মাঠ পেরোবার মতো ঝুঁকি নিতে হচ্ছে ওকে।

ওয়েট্রেস্ কোনো মন্তব্য না করে তার অ্যাপ্রনের ভিতর লুকানো লেদার ব্যাগ থেকে ভাঙতি টাকা আর খুচরো পয়সা বের করে টেবিলে রাখছে দেখে একটা হাঁফ ছাড়লো রানা। নোট আর মুদ্রা-গুলো টেবিলে ছড়িয়ে দিলো ও, যেন জিনিসের দাম ধরে বাকি টাকার হিসাব ঠিক আছে কিনা পরখ করছে।

'আমার সিগারেটের দাম তোমাকে দিতে হবে না,' বললো মেয়েটা।

মুখ তুলে হাসলো রানা। 'বি মাই গেস্ট।'

'নিজে তো খাচ্ছোই, পয়সা খরচ করে আমাকেও বিষ খাও-য়াচ্ছো', লাল চুল নেড়ে হাসলো। 'এ কেমন মর‍্যালিটি?'

'আমি তো আর মর‍্যাল ফিলোসফার নই,' আশা করলো, মিথ্যে বলছে না।

'তা নও,' স্বীকার করলো। 'দর্শনের প্রসঙ্গ যখন উঠলোই, বলো তো, সাধারণ ভাবে তোমার জীবন দর্শনটা কি? তুমি নাস্তিক? নাকি অজ্ঞেয়বাদী? নাকি মানবতাবাদী? জানতে কৌতূহল হয়।'

ধীরে ধীরে ফিলাতভের চরিত্র ফুটতে শুরু করেছে। প্রশ্নগুলো

সাধারণ, তাই দর্শন নিয়ে মেয়েটার সাথে আলোচনা করতে কোনো বাধা দেখলো না রানা। 'নাস্তিক আমি কখনোই নই, হতেও পারবো না',' বললো ও। 'কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই একথা কল্পনা করার চেয়ে জিনিসটার অস্তিত্ব আছে একথা কল্পনা করা আমার কাছে অনেক সহজ বলে মনে হয়। আমি বরং অজ্ঞেয়বাদীদের দলে যোগ দেবো, 'জানি না' বললেই ল্যাঠা চুকে গেলো, এরা দলেও সবচেয়ে ভারি। আরেকটা সুবিধে হলো, অজ্ঞেয়বাদের সাথে মানবতাবাদের কোনো বিরোধ নেই।'

নোট আর খুচরো পয়সাগুলো নাড়াচাড়া করছে রানা। এর আগে হোটেলের বারে একটা বিয়ারের দাম দিয়েছে ও। সেই হিসেবে দু'টো বিয়ারের জন্যে যা দাম হয় ধরে সিগারেটের দাম বের করার চেষ্টা করছে। মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া গেলো। হিসেবটা কতটুকু নিখুঁত, সন্দেহ আছে তবু রানার। হোটেলের বার আর খোলা কাফে, একই বিয়ারের দাম দু'জায়গায় দু'রকম হওয়ারই কথা।

সিগারেট ধরাচ্ছে মেয়েটা। চট্ করে চারদিকটা দেখে নিলো রানা একবার। হঠাৎ একটা সন্দেহ জেগেছে। তেল আবিব থেকে নরওয়েতে নিয়ে এসেছে ওকে, রেখেছে দামী হোটেলে, প্রচুর টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করেছে—এসব কাজ যাদেরই হোক, তারা ওকে চোখের আড়ালে রেখেছে এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ওর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে। হঠাৎ আরেকটা সন্দেহ জাগলো মনে। সামনে বসা এই রক্তকেশী সঙ্গিনীটিই নয় তো? কাছ থেকে নজর রাখার জন্যে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

পকেট থেকে রুমাল বের করে আবার কাশতে শুরু করলো

রানা। সঙ্গিনীর কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে না ওঠা পর্যন্ত খক্ খক্ করে কাশতেই থাকলো। তারপর রুমাল নামিয়ে বললো, 'দুঃখিত। অসুস্থ শরীর নিয়ে বাইরে বেরুনো আসলে উচিত হয়নি। বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেয়া দরকার আমার। এ ভাবে হঠাৎ চলে গেলে তুমি আবার কিছু মনে করবে না তো?'

'না-না,' উদ্বিগ্ন মুখে বললো মেয়েটা, 'আস্তন, একজন ডাক্তার…'

'তার কোনো দরকার নেই' বললো রানা। 'রাতে ভালো ঘুম হলে সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। সর্দি-কাশি এক দিনের বেশি থাকে না আমার, সাধারণত।' চেয়ার ছেড়ে উঠলো ও। পাইপ, টোবাকো, ভাংতি টাকা-পয়সা পকেটে ভরছে। আড়চোখে দেখলো মেয়েটাও উঠে দাঁড়াচ্ছে। 'কাছেই তো হোটেল, আমি একাই যেতে পারবো, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।'

একটু অবাক হয়ে তাকালো মেয়েটা রানার দিকে। 'আস্তন, আস্তন, তুমি আমার ওপর রাগ করোনি তো?'

'রাগ করবো কেন?'

'তাহলে এড়িয়ে যাচ্ছো কেন আমাকে? দেখা হবার একটু পরই হোটেলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, আর এখন…'

'ও, এই কথা?' ক্লান্তভাবে হাসলো রানা। 'আসলে শরীর এতটা খারাপ ঠিক বুঝতে পারিনি তখন। বিশ্বাস করো, রাগ করিনি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

চেয়ার সরিয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে রানা, বাধা পেলো।

'কি যেন ফেলে যাচ্ছো তুমি, আস্তন,' বললো মেয়েটা, ঝুঁকে

পড়ে তুললো জিনিসটা। 'আরে, এ যে দেখছি একটা স্পাইরালেন পুতুল!'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে রানা। নিশ্চয়ই রুমাল বের করার সময় পড়ে গেছে পকেট থেকে ওটা। 'কি বললে?'

ভুরু কুঁচকে উঠেছে মেয়েটার। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। 'গত হপ্তায় আমরা যখন স্পাইরালেনে যাই, এই পুতুলগুলো দেখে তুমি বিরক্ত হয়েছিলে। মনে নেই তোমার?'

'অবশ্যই মনে আছে,' বললো রানা। 'মাথাটা এমন সাংঘাতিক ধরেছে যে…'

রানার কথায় কান না দিয়ে হাসতে শুরু করলো মেয়েটা। 'এই জিনিস তোমার কাছে থাকবে এ আমি আশাই করিনি। কিনতে বলায় তুমি রেগে উঠেছিলে, ভুলিনি কথাটা। কোত্থেকে যোগাড় করেছো?'

সত্যি কথাটাই বললো রানা, 'ভাড়া করা গাড়িতে পড়ে ছিলো।'

'আজকাল সবাই ফাঁকি দেয় কাজে,' হাসছে মেয়েটা। 'ভালো ভাবে সাফ-সুতরো করার পর গাড়িগুলো ডেলিভারি দেয়ার নিয়ম।' পুতুলটার দিকে তাকালো সে। 'এটার কোনো দরকার আছে তোমার?'

'এমন কুৎসিত জিনিস তোমার কাছে মানায় না,' হাসতে হাসতে হাত বাড়ালো রানা, পুতুলটা মেয়েটার হাত থেকে তুলে নিলো। যাই এবার, কেমন?'

'গরম পানি দিয়ে স্পঞ্জ করে নিও শরীরটা। কেমন থাকো, সকালে ফোন করে জানিও আমাকে।'

কত নাম্বারে ফোন করবো? ফোন করে কাকে চাইবো?

'অসুস্থ লোক কখনো খবর দেয় না। তার খবর নিতে হয়।' হাসছে রানা। 'আশা করি এর মধ্যে ডিনার খাবার মতো সুস্থতা ফিরে পাবো। প্রতিজ্ঞা করছি, এবার আর তোমাকে অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রাখবো না।'

'ঠিক আছে। বিকেলের দিকে ফোন করবো আমি।'

'প্রমিজ?' মেয়েটাকে হারাতে চায় না রানা।

'প্রমিজ।'

দড়ির পুতুলটা পকেটে ভরে নিয়ে হাত নাড়লো রানা মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে, ধীর পায়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। পেছন ফিরে না তাকিয়েও অনুভব করতে পারছে, এক জোড়া চোখের দৃষ্টি বিঁধে আছে ওর পিঠে।

সামনের গেট দিয়ে ঢুকলো রানা হোটেলে। লবিতে পৌঁছে এতটুকু ইতস্তত করলো না, সোজা এগোলো পোর্টারের ডেস্কের দিকে। মুখ তুলে রানাকে দেখেই একটু হাসলো লোকটা, 'আপনার চাবি, স্যার।' আধ পাক ঘুরে হুক থেকে নামালো গোছাটা।

এক হাত দিয়ে চাবিটা নিচ্ছে রানা। অপর হাত দিয়ে পকেট থেকে পুতুলটা বের করে পোর্টারের মুখের সামনে ধরলো, 'বলো তো, কি এটা?'

পোর্টারের মুখে আরো উজ্জ্বল হলো হাসিটা। 'এটা একটা স্পাইরালেন ডল, স্যার।'

'কোত্থেকে এসেছে?'

'স্পাইরালেন থেকে, স্যার—ড্রামেনের ওই জায়গাতেই শুধু এই পুতুল তৈরি করা হয়। এর সম্পর্কে জানতে চান? আমার কাছে একটা প্যাম্পলেট আছে।'

'হ্যাঁ, জানতে চাই।'

শেলফের কাগজপত্র ঘেঁটে একটা প্যাম্পলেট বের করলো পোর্টার, রানার দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বললো, 'আপনি স্যার নিশ্চয়ই একজন ইঞ্জিনিয়ার।'

ইঞ্জিনিয়ার? আমি, মাসুদ রানা? অসম্ভব নয়, হতেও পারি। ফিলাতভের ব্যাপারটাও তাই, সে-ও ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। আবার নাও পারে। 'ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর সত্যিই আগ্রহ আছে আমার,' কিছু একটা বলতে হয়, তাই বলা। লিফলেটটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ও। এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে।

দু'জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ অনুসরণ করছে ওকে পেছন থেকে। এলিভেটরের দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত লবির দুই প্রান্ত থেকে একচুল নড়লো না দু'জন। তারপর পরস্পরের দিকে তাকালো তারা। দু'জনের মুখেই চিন্তার ছায়া। এদের উপস্থিতি কিছুই টের পেলো না রানা।

ফিলাতভের কামরায় ঢুকে পুতুল, ম্যাপ আর লিফলেটটা ড্রেসিং টেবিলে রাখলো রানা। ক্রাডল থেকে তুলে নিলো ফোনের রিসিভার।

'বহু দূরে আমি একটা ফোন করতে চাই—ইসরায়েলে।' পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করলো ও।

'নাম্বারটা বলুন, প্লিজ, স্যার।'

'ওখানেই একটু অসুবিধে। আমার কাছে ঠিকানা আছে, কিন্তু ফোন নাম্বার নেই।' এক হাত দিয়ে ওয়ালেট খুলে ফিলাতভের একটা কার্ড বের করলো ও।

শুকনো গলায় টেলিফোনিস্ট বললো, 'সেক্ষেত্রে বেশ একটু সময়

লাগতে পারে, স্যার।'

'লাগুক। রুমেই আছি আমি।'

'ঠিকানাটা দিন, স্যার।'

স্পষ্টভাবে বললো রানা, হ্যাপি ভিলা, ম্যাডোনা এভিনিউ, কারাকাস, তেল আবিব। তিনবার পুনরাবৃত্তি করলো ও, লোকটা যাতে লিখে নিতে ভুল না করে।

'নামটা, স্যার? যাকে ফোন করতে চাইছেন?'

মুখ খুললো রানা, সাথে সাথে বুজেও ফেললো। অকস্মাৎ চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা লাগছে। ফিলাতভের নাম বললে গর্দভ ভাববে লোকটা ওকে—সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো লোক নিজেকে কখনো ফোন করে না, বিশেষ করে নিজের টেলিফোন নাম্বার নিজেই জানে না স্বীকার করার পর। ঢোক গিললো ও। মৃদু গলায় বললো, 'নামটা জানা নেই।'

রানার কানে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আছাড় খেলো। 'যথাসাধ্য চেষ্টা করবো স্যার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটা চেয়ারে বসলো রানা। স্পাই-রালেন পুতুলটা সম্পর্কে কি জানার আছে, দেখা যাক। লিফলেটের সামনে একটা হেডিং: ড্রামেন। স্পাইরালেন ডলের একটা আঁকা ছবি ছাপা রয়েছে। নীল কালিতে। চারটে ভাষায় ছাপা হয়েছে লিফলেটটা।

বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'স্পাইরালেন পর্যটকদের জন্যে একটা উৎকৃষ্ট মানের আকর্ষণ, এবং সেই সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় একটুকরো অপরূপ সুন্দর নিদর্শন।' আসল ব্যাপারটা এই রকম: ড্রামেনের কাছে একটা পাহাড়, নাম তার ব্রাগারনেসাসেন। এর পাদদেশে খণ্ড

পাথরের একটা বেঢপ স্তূপ এলাকার সৌন্দর্য হানি ঘটাচ্ছিলো, তাই সিটি ফাদাররা এর একটা বিহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। পাহাড়ের মুখ থেকে পাথরগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে গিয়ে, তার বদলে, পাহাড়ের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলা হয়। ত্রিশ ফিট চওড়া, পনেরো ফিট উঁচু এবং দীর্ঘ এক মাইল লম্বা একটা সুড়ঙ্গ। কিন্তু সরলরেখার মতো সোজা নয়। খানিক দুর এগিয়ে আবার খানিকটা পিছিয়ে এসেছে—এভাবে মোট ছয়বার। ছয়বার আগু-পিছু করতে করতে সুড়ঙ্গটা উঠে গেছে পাঁচশো ফিট উপরে, ব্রাগারনেসাসেনের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়েছে, ঠিক যেখানটায় এখন স্পাইরাল টোপেন রেস্তোরাঁটাকে দেখা যায়। ওখান থেকে চারদিকের দৃশ্য নাকি স্বর্গীয় মহিমা ছড়ায়।

পুতুলটা তুলে নিলো রানা। একখণ্ড দড়িকে ছয়বার বাঁক খাইয়ে তৈরি করা হয়েছে এর শরীরটাও। মুখটা হাসি হাসি করলো রানা।

ম্যাপ নাড়াচাড়া করে জানলো রানা, অসলো থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ড্রামেন ছোট্ট একটা শহর। সকাল বেলা ড্রাইভ করতে ভালোই লাগবে, রক্তকেশীর ফোন ধরার জন্যে বিকেলের মধ্যে ফিরে আসতেও পারবে। আর কোনো সূত্র নেই যখন, এটা ধরেই এগোনো যাক, ভাবলো ও।

অবশিষ্ট বিকেলটা ফিলাতভের এটা সেটা সার্চ করে কাটালো রানা, কিন্তু সূত্র বলা যায় এমন কিছু পেলো না। নিচের হোটেল ডাইনিং হলে গিয়ে ডিনার খাওয়ার ইচ্ছাটা বাতিল করে দিলো ও। সন্দেহ, রক্ত-মাংসের জ্যান্ত অবিস্ফোরিত বোমায় জায়গাটা গিজগিজ করছে। এক রক্তকেশীকে সামলাতেই হিমশিম খেতে হয়েছে ওকে, আর দরকার নেই। রুম সার্ভিসকে ডেকে ডিনারের

অর্ডার দিলো ও।

খাওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় টেলিফোনটা এলো। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো রানা। যান্ত্রিক ঘড়ঘড়ানি শুনলো কিছুক্ষণ, তারপর বহুদূর থেকে অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'ডক্টর ফিলাতভের বাড়ি।'

ডক্টর!

'আমি ডক্টর ফিলাতভের সাথে কথা বলতে চাই।'

'দুঃখিত, স্যার। ডক্টর ফিলাতভ বাড়িতে নেই।'

'কোনো ধারণা দিতে পারো, কোথায় তাঁকে পাবো?'

'এই মুহূর্তে তিনি দেশের বাইরে আছেন, স্যার।'

'ও। বলতে পারো দেশের বাইরে কোথায়?'

কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। তারপর, 'আমার বিশ্বাস, তিনি স্কানডিনেভিয়া সফর করছেন, স্যার।'

কোনো লাভ হচ্ছে না, বুঝতে পারছে রানা। 'কার সাথে কথা বলছি আমি?'

'আমি হেনরি, ডক্টর ফিলাতভের পার্সোন্থাল সার্ভেন্ট। আপনি কোনো মেসেজ দিতে চান, স্যার?'

'আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারছো তুমি, হেনরি?' বুদ্ধি করে জানতে চাইলো রানা।

বিরতি। 'লাইনটা গোলমাল করছে।' আবার বিরতি। 'টেলিফোনে কথা বলার সময় কিছু অনুমান করতে আমি অভ্যস্ত নই, স্যার।'

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'ডক্টর ফিলাতভের সাথে দেখা হলে বলবে মাসুদ রানা ফোন করেছিলো, এবং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব

তার সাথে যোগাযোগ করবো আমি। বুঝেছো?'

'মাসুদ রানা। হ্যাঁ, মিঃ রানা।'

'ডক্টর ফিলাতভ কবে নাগাদ ফিরবেন বলে আশা করছো তুমি?'

'আমার জানা নেই, মিঃ রানা।'

'ঠিক আছে, হেনরি,' থমথম করছে রানার মুখের চেহারা। ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো ও।

চার

ভালো ঘুম হলো না রাতে। নিটোল ঘুমের গায়ে এখানে সেখানে অনেকগুলো কুৎসিত ফুটো তৈরি করলো অনেকগুলো দুঃস্বপ্ন। জেগে উঠে প্রতিবার চেষ্টা করলো স্মরণ করতে, কিন্তু কয়েকটা ভয়াল দৈত্যাকার চেহারার ছায়ামূর্তি ছাড়া স্বপ্নের আর কিছুই মনে করতে পারলো না ও। ভোরের দিকে ঘুমটা হলো নিটোল। ঘুম থেকে ওঠার পর শরীরটা ভারি ঠেকছে। মনটা অস্থির, চঞ্চল।

বিছানা থেকে নেমে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো রানা। বদলে গেছে আবহাওয়া। সীসার মতো রঙ হয়েছে আকাশের। ফুটপাত ভিজে রয়েছে এখনো। বাতাসে গা-জুড়ানো ঠাণ্ডা একটা ভাব। আবার বৃষ্টি আসবে বলে মনে হলো ওর।

বাগানে ছাতার নিচে চেয়ার টেবিলগুলো খালি পড়ে আছে। রাস্তার ওপারে দোকান পাটগুলো খোলা, খোলা আউটডোর কাফে-টাও, কিন্তু জনশূন্য।

টেলিফোনে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে বাথরুমে ঢুকলো রানা। শাওয়ার থেকে ছুটে বেরিয়ে আসা ঝাঁক ঝাঁক হিম শীতল বর্শা। শরীরের সব জড়তা দূর করছে, শক্তি পাচ্ছে রানা, আরাম বোধ করছে।

ফ্লোর ওয়েট্রেস ব্রেকফাস্ট নিয়ে কামরায় যখন ঢুকলো, পোশাক পরা শেষ করেছে তখন রানা। হাল্কা বাদামী ট্রাউজারের উপর সাদা পোলো-নেকড সোয়েটার পরেছে। মাথার চুলে চিরুণী চালাচ্ছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগছে ওর, নিজের ঘাড়ের উপর বসানো ফিলাতভের মুখে চোখ রেখে ঠোঁট গোল করে শিস দিচ্ছে ও।

ব্যাপক ব্রেকফাস্টের আয়োজন। হেরিং মাছ ছুঁলোই না রানা। সেদ্ধ একটা ডিম, রুটি, মার্মালেড আর কফি খেলো। ব্রেকফাস্ট শেষ করে আরেকবার উঁকি মেরে দেখে নিলো আবহাওয়াটা, তারপর ওয়ারড্রোব থেকে বেছে নিলো একটা জ্যাকেট আর একটা শর্ট টপ কোট। চেন লাগানো একটা ব্যাগে ভরলো ম্যাপগুলো। লিফলেটটাও নিলো, ওটার পেছনে ড্রামেনের রাস্তা-ঘাট আঁকা আছে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিচে নামলো রানা। কোথাও থামলো না, সোজা পার্কিং লটে পৌঁছুলো। ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে হোটেলের বাইরে। ঠিক ন'টা বাজে এখন।

শহর থেকে সহজে বেরুতে পারা গেলো না। অপরিচিত পথ, রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে, গাড়িটাও অস্বাভাবিক বড় আর শক্তিশালী। তার উপর অফিস আওয়ারের নিদারুণ ভিড়।

তিনবার তীর চিহ্ন আঁকা সাইনবোর্ড দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ায় বাঁক নিয়ে অনেক দুর চলে গিয়ে পরবর্তী বাঁকের কাছে পৌঁছে ভুলটা বুঝতে পারলো। প্রথম ভুলটা সবচেয়ে বেশি ভোগালো ওকে। ভুলটা ধরা পড়লেও সাথে সাথে সংশোধনের কোনো উপায় দেখলো না। সামনে পেছনে একশো মাইল স্পীডে ছুটছে অসংখ্য গাড়ি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া মানে, দুর্ঘটনা। রাশ আওয়ারে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করালে পুলিশের খপ্পরে পড়তে হবে। আশপাশেই তাদেরকে মোটরসাইকেলের উপর দেখতে পাচ্ছে রানা। জলপ্রপাতে ছোট্ট একটা কুটোর মতো নিজেকে ভেসে যেতে দিলো রানা। ইতিমধ্যে পথও হারিয়ে ফেলেছে। পেছন থেকে গাড়ির বিকট তাগাদায় কত-বার ডানে-বাঁয়ে মোড় নিয়েছে, খেয়ালই নেই।

বিশ মিনিট পর সঠিক পথটা অনেক কষ্টে খুঁজে বের করলো ও। এরপর যখনই ধরতে পেরেছে বাঁক নিতে ভুল হয়েছে, গাড়ির নাক ঘোড়াবার সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে পিছু হটিয়ে নিয়ে এসেছে গাড়িকে।

ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি রানা, একটা সুইডিশ ভোলভো গাড়ি অনুসরণ করছে ওকে। ঘেমে অস্থির হয়ে গেছে লুইস পাঞ্জার। ভুল করে আর কাউকে অনুসরণ করছে কিনা সে ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে তার মনে, যদিও তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। স্পষ্ট দেখেছে সে ডক্টর ফিলাতভকে হোটেল থেকে মার্সিডিজ নিয়ে বেরিয়ে আসতে। ব্যাপারটা কি? নিরীহ গোবেচারা ফিলাতভ আজ এমন তুখোড় ড্রাইভার হয়ে উঠলো কিভাবে? অত্যন্ত ভীতু আর সাবধানী লোক, ত্রিশের বেশি স্পীড কখনই তোলে না। অথচ আজ কিনা কাঁটা একশোর উপর···শুধু কি তাই? এমন সব কৌশল খাটাচ্ছে,

চোখ কপালে উঠে গেছে তার।

শেষ পর্যন্ত শহরের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারলো রানা। ইতিমধ্যে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। ছয়টা শাখা নিয়ে একটা হাইওয়ে। দু'দিকে তিনটে তিনটে করে উইণ্ডস্ক্রীন থেকে পানি সরাবার কাজে ওয়াইপার দু'টো সাংঘাতিক ব্যস্ত, কিন্তু ঝম ঝম বৃষ্টির সাথে পেরে উঠছে না বেচারারা। সামনেটা ঝাপসা দেখতে পাচ্ছে রানা। তবে মাথার উপর, খিলানের কপালে ড্রামেন লেখা সাইন-বোর্ড দেখে স্বস্তি বোধ করছে এখন।

ওর বাঁ দিকে সাগর, বহুদূর পর্যন্ত ঢুকে পড়া অসলোফর্ডের গভীর বাহু। রাস্তাটা ধনুকের মতো বেঁকে গেছে, খানিক পর সাগরকে হারিয়ে ফেললো রানা। বৃষ্টি থেমে গেলো, কিন্তু সূর্য এখনো মেঘের আড়ালে। পার্বত্য এলাকার সবটাই সবুজ গাছপালায় ঢাকা। সদ্য বৃষ্টি ধোয়া, নরম ছায়ায় মোড়া পরিবেশটা উপভোগ করছে রানা। হুট্ করে পৌঁছে গেলো ড্রামেনে। গাড়ি থামিয়ে লিফলেটের পেছনে ছাপা প্ল্যানটা দেখে নিলো ও

তবু ডানদিকের অপ্রশস্ত বাঁকটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো ওর। বেশ খানিকদূর এগিয়ে যেতে হলো, তারপর প্রথম সুযোগেই পিছু হটিয়ে আনতে শুরু করলো গাড়িটাকে। গভীর, গম্ভীর টানেলের মুখটা দূর থেকে দেখতে পেলো ও। গাড়ি থামাতে হলো। ঢোকার জন্যে টোল দিতে হলো দুই ক্রোনার।

গিয়ার দিয়ে ধীর গতিতে সামনে এগোলো রানা। প্রথম দিকে টানেলটা সমতল এবং সোজা, তারপর উপর দিকে উঠতে শুরু করেছে, বাঁক নিচ্ছে বাঁ দিকে। স্বল্প আবছা আলোর ব্যবস্থা থাকলেও বোতাম টিপে হেডলাইট দু'টো জ্বেলে দিলো রানা। কর্কশ ভিজে

পাথরের গায়ে ঝিলিক দিয়ে উঠলো আলোর প্রতিবিম্ব।

উঁচু হয়ে উঠে গেছে ক্রমশঃ টানেলটা, কিন্তু কোথাও খানাখন্দ নেই, ওঠারও নির্দিষ্ট একটা সাবলীল হার বজায় আছে প্রতি গজে। বাঁকগুলোও বিপজ্জনক কোণ সৃষ্টি করেনি, মস্ত এলাকা নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে টানেলটা। ওয়ান লেখা একটা চিহ্ন পেরিয়ে এলো রানা। ধরনটা ধরতে পেরে ঢিলে হয়ে গেছে কাঁধের পেশী। এখন শুধু হুইল ধরে চুপচাপ বসে থাকা, লো গিয়ারে উপর দিকে আপনা-আপনি উঠে যাচ্ছে মার্সিডিজ।

তবু মজার একটা অভিজ্ঞতা বটে, একটা পাহাড়ের মাঝখানে রয়েছে ও, উপর দিকে উঠছে। থ্রী লেখা চিহ্নটা পেরোবার সাথে সাথে দু'টো হেডলাইট চোখ ধাঁধিয়ে দিলো ওকে, পাশ কাটিয়ে স্যাঁত করে নেমে গেলো নিচের দিকে। এই একটু যা অসুবিধেতে পড়লো, সারা পথে আর কোনো ঘটনা নেই।

সিক্স লেখা চিহ্নটা পেরোবার একটু পরই টানেল থেকে বেরিয়ে এলো রানা। বেরুবার মুখেই প্রচণ্ড আদর, সূর্য যেন ওত্ পেতে ছিলো ওর জন্যে, ঝট করে মেঘের কিনারায় চলে এসে একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানালো ওকে। আদরের ঠ্যালা খেয়ে চোখ বুজে ফেললো রানা।

দু'সেকেণ্ড পর চোখ মেলে সামনে রোদ ঝলমলে সমতল মাঠ দেখছে রানা। ওর বাঁ দিকে বিরাট একটা গাড়ি পার্ক করার জায়গা, কিন্তু একটাও গাড়ি নেই সেখানে। ওটার পেছনে কাঠের একটা বাড়ির মস্ত ছাদ, কাঠামোটা ফ্রেঞ্চ ভিলা শ্যালের মতো। যথাসম্ভব বাড়িটার কাছে গাড়ি থামালো রানা, নিচে নেমে দরজায় তালা লাগালো।

আর কোনো বিল্ডিং নেই, তার মানে এই শ্যালেই স্পাইরাল-টোপেন রেস্টুরেন্ট। চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো নির্জন লাগছে জায়গাটাকে। দরজার কাঁচ ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেলো ভিতরে। আর একটু হলে হেসেই ফেলেছিলো। মস্ত তুই ব্যাঙের মতো মেঝেতে মুখোমুখি বসে আছে দু'টো মেয়ে, দু'জনেই এদিক ওদিক দুলছে। আজব ধরনের কোনো নাচ? ভাবছে রানা। হঠাৎ বুঝলো, না। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মেঝে মুছছে ওরা। সময়টা এখনো খুব সকাল। কয়েক পা পিছিয়ে এসে প্রবেশপথের বাইরে বিকট একটা স্পাইরালেন পুতুলকে দেখতে পেলো ও, তাগড়া যোয়ান মানুষের মতো বড়, চোখে-মুখে নির্দয় একটা হাসি ফুটে আছে।

নিজের চারদিকে তাকালো ও। একটা সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে পাহাড়ের কিনারার দিকে, শেষ মাথায় নিচু পাথরের একটা পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় মুদ্রা গলিয়ে দেবার ফুটো গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা টেলিস্কোপ। সরু একটা পায়ে চলা পথ ধরে খানিকদুর এগোলো রানা। উঁকি মেরে তাকালো পাঁচিলের ওপারে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে ড্রামেন উপত্যকা। ভাঁজ খেয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে মেঘ-গুলো, দিগন্তরেখার ওপারে হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। অনেক নিচে রোদ লেগে পারদের মতো টলমল করছে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো নদীর পানি।

খুবই সুন্দর, বিরক্ত হয়ে ভাবছে রানা, কিন্তু এখানে আমি কর-ছিটা কি? কি পাবো বলে আশা করছি? ড্রামেন ডলি, কোথায় তুমি?

উত্তরটা হয়তো রেস্তোরাঁয় পাওয়া যাবে। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে পাঁচ মিনিট পার করে দিলো ও, তারপর রেস্তোরাঁর দরজার কাছে ফিরে এলো। মেয়ে ব্যাঙ দু'টোকে কোথাও দেখছে না এখন।

ভিতরে ঢুকে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসলো। অস্বাভাবিক লম্বা একটা হলরুম। শেষ মাথা থেকে এগিয়ে আসছে একটা মেয়ে। ছ্যাঁত করে উঠলো রানার বুক। অল্প বয়স। উনিশ কি বিশ, চমকে দেবার মতো রূপ। শরীরে আগুন জ্বালা নিয়া নয়, অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা, কোমল, বিষণ্ণ সৌন্দর্য ঘিরে রেখেছে মেয়েটাকে। দরজার কাঁচ ভেদ করে বাইরে চলে গেছে উদাস দৃষ্টি। কার কথা যেন ভাবছে! এমন একটা বৃষ্টি হয়ে গেলো, মনের মানুষ কাছে নেই। কাছে এসে তাকালো একবার রানার দিকে। মুখ ফিরিয়ে নিলো, আবার চোখ চলে গেছে দরজার বাইরে, বহু দূরে।

ছটফট করে উঠলো বুকটা রানার। বুড়ো এই মুখটার বদলে ওর নিজের মুখটা যদি থাকতো, নিশ্চয়ই এভাবে চোখ ফেরাতে পারতো না মেয়েটা। অন্যদিকে তাকিয়ে অর্ডার নিলো সে, চলে গেলো। রানা জানে, শত চেষ্টা করেও মেয়েটিকে বোঝাতে পারবে না ও যে আসলে চেহারাটা ওর একবার দেখেই চোখ ফিরিয়ে নেবার মতো ছিলো না।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই শিউরে উঠলো রানা। ওর এই বুড়ো-হাবড়া নতুন চেহারা—এটা কি স্থায়ী হতে যাচ্ছে? কোনো মেয়ের কাছে আর কখনো ঘেঁষতে পারবে না ও?

একটা আক্রোশ অনুভব করছে রানা। টেবিলে পড়ে থাকা হাত দু'টো নিজের অজান্তেই শক্ত মুঠো হয়ে গেলো। অসহায় একটা রাগে ঝাপসা হয়ে গেলো চোখের সামনেটা। নিঃশব্দ পায়ে কখন আবার কাছে চলে এসেছে সেই ঠাণ্ডা কোমল অবয়বধারিণী, ঠক্ করে একটা শব্দ হতে হুঁশ ফিরলো রানার, দেখলো কফির কাপটা নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছে।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, সেইসাথে চোখ বুলাচ্ছে লিফলেটে। ও এখন Bragernesasen-এর মাথায় রয়েছে, ড্রামেন্স্মার্কার দরজা বলা হয় জায়গাটাকে। শীতের সময় এটা স্কিয়ারদের স্বর্গ, তাদের চলার পথে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা আছে। আর গ্রীষ্মের সময় এটা শিকারীদের স্বর্গ, তখন বিশাল এলাকা জোড়া জঙ্গলে প্রাণীবধের মহোৎসব চলে। হয়তো ওখানেই কিছু আছে, ভাবলে ও। কফির দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো তখুনি।

আরেকটা গাড়ি পৌঁছেচে, কার পার্কের অপর দিকে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। হুইলের পেছনে বসা লোকটা খবরের কাগজ পড়ছে। রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ হবার শব্দে মুখ তুলে তাকালো, রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখে আবার পড়ায় মন দিলো সে।

গায়ে ভালো করে বসিয়ে নিলো রানা টপকোটটা হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। পাহাড়ের কিনারার দিকে পেছন ফিরে দৃঢ় পায়ে এগোচ্ছে ও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দর একটা বনভূমিতে প্রবেশ করলো রানা। চারদিকে তাল গাছের মতো লম্বা দেবদারু গাছ। পাতা ঝরা, নিঃস্ব আরেক জাতের গাছ দেখতে পাচ্ছে রানা, দেবদারুগুলোর মতোই আকাশ ছোঁয়া, কিন্তু পাতা নেই বলেই বুঝি ঠিক চেনা যাচ্ছে না। ওগুলো সাদাটে, বার্চও হতে পারে।

কার পার্ক থেকে খানিকদুর সোজা, তারপর এঁকেবেঁকে চলে এসেছে পায়ে চলা পথটা। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকালো ও। রেস্তোরাঁর উঁচু ছাদটাও এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

পথটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, নিজেকে জিজ্ঞেস করে ডান দিকে এগোবার অনুমতি নিলো ও। আরো মিনিট দশেক হাঁটার পর

হঠাৎ দাঁড়ালো। এখানে ও করছেটা কি? একটা গাড়িতে কদাকার চেহারার একটা পুতুল দেখেই নরওয়ের পাহাড়ী এলাকার জঙ্গলে চলে এলো সে?

রক্তকেশী মেয়েটার কথা মনে পড়ছে। তার ধারণা, গাড়িটা এর আগে যে ভাড়া করেছিলো পুতুলটা সেই ফেলে রেখে গেছে। উঁহু, তা ঠিক বলে মনে করা যায় না। গাড়িটা একেবারে নতুন। এর আগে কাউকে ভাড়া দেয়া হয়নি। তাছাড়া, পুতুলটা এমন ভঙ্গিতে সীটের উপর রাখা ছিলো, যেন ওর দৃষ্টিতে পড়ে।

চিরকূটে ভোরে আসার কথা বলা হয়েছে। ভোরে বলতে কি বোঝাচ্ছে? কতো ভোরে? বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো, মনে মনে ডাকছে রানা, বেরিয়ে এসো আমার ছোট্ট ড্রামেন পুতুল। তোমার যাদু দণ্ড নেড়ে আমাকে তেলআবিবে পৌঁছে দাও।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথে এগোচ্ছে রানা। তেমাথায় পৌঁছে এবার বাঁ দিকের পথটা ধরলো। বৃষ্টির পর তাজা আর পরিষ্কার হয়ে গেছে বাতাস। পাতার কিনারায় ঝুলন্ত পানির ফোঁটাগুলো পড়ো পড়ো, রোদ লেগে স্বচ্ছ মুক্তোর মতো দেখাচ্ছে, বাতাসের নাড়া খেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে রানার মাথায়।

ভিজে ঘাস, ঝোপ-ঝাড়, মাথা উঁচু গাছ ছাড়া কোথাও কিছু দেখছে না রানা। সামনে আরেকটা তেমাথা। থামলো। কি করবে ভাবছে। শব্দটা হঠাৎই এলো, একটা ডাল ভাঙার আওয়াজ, কিন্তু অস্পষ্ট। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ও। কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকালো। কোথায়! কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে নেবে, এমন সময় আবার একটা শব্দ। এবার ওর ডান দিক থেকে এলো।

চোখের কোণ দিয়ে কিছু একটা দেখলো রানা। গাঢ় রঙের কি

যেন, দ্রুত সরে গেলো গাছের আড়ালে।

তৃতীয় শব্দটা এলো পেছন দিক থেকে। চরকির মতো আধপাক ঘুরলো রানা। প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে আসছে আক্রমণ। এতো কাছে চলে এসেছে লোকটা, হকচকিয়ে গেলো রানা।

লোকটা বিশাল, মস্ত কাঁধ, ডান হাতটা উপরে তোলা, তাতে লোহার রড কিম্বা আর কিছু ধরা, সবেগে নেমে আসছে রানার মাথায়।

হকচকিয়ে গেলেও, গতকাল ও আজকের অভিজ্ঞতায় বেপরোয়া একটা মনোভাব তৈরি হয়েছে রানার মধ্যে। তার উপর, লোকটার চেহারা দেখেই বুঝলো দেশ এবং জাতির পরম শত্রু ব্যাটা, আরব। পাল্টা আঘাত করার এই সুযোগের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলো ও। পিছিয়ে আসার কথা, কিন্তু, লোকটাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে সামনে বাড়লো এক পা। বাঁ হাত তুলে শত্রুর ডান হাতের কব্জি ধরে ফেললো, সেইসাথে প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালালো তলপেট লক্ষ্য করে।

হুস্ করে বাতাস বেরিয়ে এলো লোকটার নাক মুখ থেকে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেলো, প্রথমে কোমরটা পড়লো মাটিতে, তারপর ঠুকে গেলো মাথাটা। ঘুসিটা কিরকম জোরে লেগেছে অনুমান করে একটু অবাক হলো রানা। বমি করছে লোকটা।

সময় নষ্ট করলো না রানা। দৌড়ুতে শুরু করেছে ফিরতি পথ ধরে। কিন্তু আরেক জোড়া পায়ের আওয়াজ। ঠিক পেছনেই। তাকিয়ে দেখে সময় নষ্ট করছে না ও, মাথা নিচু করে ছুটছে। বাঁ চোখের কোণে আরেকটা লোক ধরা পড়লো। লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে ওর আগে আগে, কোণাকুণিভাবে ছুটছে লোকটা। গাছের ফাঁকে

মাঝেমধ্যে দেখা যাচ্ছে তাকে। সামনের পথের উপর রানার আগে পৌঁছুতে চেষ্টা করছে সে। তার চেষ্টা সফল হতে যাচ্ছে, সহজ হিসাবেই বুঝে নিলো রানা।

রুখে যখন দাঁড়াতেই হবে, খামোকা দৌড়ে ক্লান্ত হবার কোনো মানে হয় না। দাঁড়িয়ে পড়লো ও। ঠিক পনেরো গজ সামনে পৌঁছুলো লোকটা। এও দশাসই চেহারার একজন আরব দুশমন। হাঁপাচ্ছে। পেছনের পায়ের আওয়াজটাও দ্রুত কাছে চলে আসছে।

পরিস্থিতিটা বুঝতে এক সেকেণ্ড সময় নিলো রানা। দাঁড়িয়ে থাকা মানে ফাঁদে ধরা দেয়া। কথাটা মনে হতেই ছুটলো আবার। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তার দিকে রানাকে আবার ছুটে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেলো। পরমুহূর্তে বাধা দেবার জন্যে তৈরি হলো সে। একটানে বের করলো কোমরে গোঁজা ধারালো ছোরাটা, কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে গেলো শরীর, মাথা নিচু করে আক্রমণের ভঙ্গিতে ছোরাসহ ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো সামনে। রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠলো ইস্পাতের ফলা।

তবু সোজা ওর দিকে রানাকে ছুটে আসতে দেখে থতমত খেলো লোকটা, লোকটার একগজের মধ্যে পৌঁছেও দিক বদলালো না রানা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সামনের দিকে ছোরা চালাতে যাচ্ছে লোকটা এইসময় বাঁ-দিক দিয়ে পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলো রানা। শেষ মুহূর্তে আক্রমণের ধারাটা সংশোধন করতে যাচ্ছে শত্রু, দেখেই আগে থেকে যা ভেবে রেখেছিলো তাই করলো ও। শরীরটাকে অদ্ভুতভাবে একটা মোচড় খাইয়ে চোখের পলকে লোকটার ডানদিকে চলে এলো রানা, পাশ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ছোরাটা বাঁক নিয়ে, অর্ধবৃত্ত রচনা করে ঝিলিক দিয়ে ছুটে

এলো। গরম একটা ছ্যাঁকা অনুভব করলো রানা পাঁজরে। কিন্তু লোকটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে ও, ঝেড়ে দৌড়াচ্ছে। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা শিকড়গুলোকে সাবধানে টপকে যাচ্ছে, এখন পা বেঁধে না গেলেই শেষ রক্ষা হয়। এক নম্বর শত্রুকে গোণার মধ্যে ধরছে না ও, উঠে দাঁড়াতে তার কম করেও দু'মিনিট লাগবে। বাকি থাকলো ছোরাধারী আর পিছু ধাওয়াকারী।

পেছন থেকে চেঁচামেচি ভেসে আসছে, কিন্তু তাকালো না রানা। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সমতল জায়গাটায় পৌঁছুলো, তীরবেগে সোজা গাড়ির দিকে ছুটছে। দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার ঝুঁকিটা নিলো ও, দেখলো পার্ক করা গাড়ি থেকে নেমে ওর দিকে ছুটে আসছে সেই লোকটা। খবরের কাগজ পড়াটা তাহলে ভান।

ফুটোয় চাবি ঢোকাচ্ছে রানা। চুল পরিমাণ এদিক ওদিক ঠোকর খেয়ে ফিরে আসছে চাবি, ভিতরে ঢুকছে না। অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এমন হচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে চোখ রাঙালো রানা। ঢুকলো চাবিটা, মোচড় দিতেই ক্লিক করে শব্দ হলো একটা, হেঁচকা টান মেরে দরজাটা খুলেই লাফ দিয়ে উঠে পড়লো ড্রাইভিং সীটে। ইগনিশন লকে চাবি ঢোকাচ্ছে এক হাতে, অপর হাত দিয়ে দরজাটা বন্ধ করছে।

দরজা বন্ধ করে চোখ ফেরাতে যাবে, লোকটাকে দেখতে পেলো বাইরে। মুঠো পাকানো ঘুসি মারলো জানালার কাঁচে, তারপর হাত বাড়ালো দরজার হাতলের দিকে। আঁতকে উঠলো রানা। দরজাটা ধরতে গিয়ে চাবিটা পড়ে গেলো আঙুলের ফাঁক গলে। বাইরে থেকে লোকটা সর্বশক্তি দিয়ে হাতলটা টানছে, কিন্তু টেনে আটকে রেখেছে

রানা, হাতের পেশী ফুলে উঠেছে ওর। একটা হাত সরিয়ে নিয়ে ঝটকা মেরে নামিয়ে দিলো ডোর ক্যাচ। নিচু হয়ে মেঝেতে ঠেকালো ডান হাতটা, হাতড়াচ্ছে।

ফুসফুসে কষ্ট হচ্ছে ওর। হাঁপাচ্ছে। পাঁজরের ব্যথাটা হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠলো। কোথায় পড়েছে চাবিটা? পাঁচটা আঙ্গুল কিলবিল করছে মেঝেতে। নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যেও ঠাণ্ডা একটা যুক্তি ঢুকলো ওর মাথার, এখন ও মোটামুটি নিরাপদ, তালা দেয়া গাড়ির ভিতর কেউ ঢুকতে পারবে না। আর চাবিটাও পাওয়া যাবে।

শীতল ধাতব স্পর্শ পেলো রানার আঙ্গুলে। খপ্ করে ধরলো, তুলে এনে ইগনিশন লকের ফুটোয় ঢোকালো। ঠাণ্ডা যুক্তিটা কর্পূরের মতো উবে গেলো হঠাৎ: লোকটা এক পা পিছিয়ে গিয়েই পকেট থেকে রিভলভার বের করলো দেখে উন্মত্তের মতো ক্লাচে পা ঠুকলো রানা, ঝটকা মেরে ফার্স্ট গিয়ার দিলো, রাস্তার কংক্রিটের সাথে ঘষা খেয়ে পুড়ে গেলো টায়ারের রাবার—হুইল ধরার আগেই তীরবেগে ছুটতে শুরু করেছে মার্সিডিজ, মাতালের মতো এদিক ওদিক করছে, তারপর সিধে হয়ে ডাইভ দিয়ে পড়লো টানেলের মুখে, ভীতসন্ত্রস্ত ইঁদুরের মতো স্যাঁত্ করে ঢুকে গেলো গর্তের ভিতর।

পলকের জন্যে এক ঝলক দিনের আলো দেখতে পেলো রানা ভিউমিররে। দু'টো দরজাই খোলা অপর গাড়িটার, চালকের হাতে বন বন করে ঘুরছে স্টিয়ারিং হুইল, টানেলের দিকে ছুটে আসছে গাড়িটা। ইঁদুরের পিছু ধাওয়া করছে যেন বিড়াল।

প্রথম বাঁকটায় পৌঁছুতে দশ সেকেণ্ড লাগলো রানার। বুঝলো, বিপজ্জনক স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে ও। ক্রমশঃ ঢালু হয়ে প্রতি দশ ফিটে এক ফিট নেমে গেছে টানেলের মেঝে, মোচড়টার ব্যাসার্ধ মাত্র

একশো বাইশ ফিট, বাঁক নিয়ে চলে গেছে ডানদিকে, যার ফলে মাঝের রেখার ভিতর দিকে থাকতে হচ্ছে রানাকে। অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটছে, কেন্দ্রাতিগ শক্তি (centrifugal force) মাঝের রেখার ওপারে টেনে আনতে চাইছে গাড়িটাকে, বিপরীত দিক থেকে কিছু যদি এই মুহূর্তে আসে, মুখোমুখি সংঘর্ষ ঠেকাবার কোনো উপায় নেই।

একটু একটু করে পায়ের চাপ কমিয়ে আনলো রানা অ্যাকসিলারেটর থেকে। দৃষ্টি সরানো বিপজ্জনক, তবু পলকের জন্য ঝুঁকিটা নিয়ে ভিউমিররে তাকালো। পিছনের গাড়ির চালক নিঃসন্দেহে দুঃসাহসী। নিজের বা বিপরীত দিক থেকে আসতে পারে যে সব গাড়ি সেগুলোর প্রতি তার কোনো দরদ নেই। মাঝের রেখা পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে সে, ক্রমশঃ মার্সিডিজের কাছে চলে আসছে।

ইঞ্জিনে আরো ফুয়েল ঢাললো রানা, মোচড় দিয়ে ঘোরালো হুইল, ভাবলো—সামনের মুখ দিয়ে যদি কোনো গাড়ি টানেলে ঢুকে থাকে, সংঘর্ষের পর রক্ত, গুঁড়ো হাড় আর আগুন ছাড়া কিছু চেনা যাবে না।

টানেলের ভিজে দেয়ালগুলো আলোর দীর্ঘস্থায়ী ঝলক যেন, এক জায়গায় সেই আলোর ঝলক একটু একটু বেশি উজ্জ্বল, পলকের জন্যে একটা সংখ্যা দেখতে পেলো রানা, 5, তার মানে নিচে পৌঁছুতে আরো চারটে সার্কিট পেরোতে হবে। অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলো গাড়ির চাকা, থরথর করে কেঁপে উঠলো মার্সিডিজ, ধাক্কা খেয়ে বেঁকে গেলো নাক। হুইলটাকে ধরে রাখতে পারছে না রানা, সেকেণ্ডে কয়েকবার তীব্র ঝটকা মেরে মুঠো থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এক সেকেণ্ড পরই পুনরাবৃত্তি হলো ঘটনাটা, ধাতব কান্নাটা পেছন

থেকে ভেসে এলো, ধাক্কাটা লাগলো আবার জোরে। মার্সিডিজকে গুঁতো মারছে পেছন থেকে। আরেকটা তীক্ষ্ণ কান ফাটানো আওয়াজে কেঁপে উঠলো গোটা টানেল, ইস্পাতের নখরের আঁচড় লেগে ছিঁড়ে যাচ্ছে ইস্পাতের পাত। হুইল ঘুরিয়ে লাভ হচ্ছে না, ঘুরে যাচ্ছে গাড়ি। টানেলের উপর আড়াআড়ি অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

শুনলো এবং অনুভব করলো রানা, বিপরীত দিকের দেয়ালে গাড়ির রিয়্যার অফ-সাইড ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেলো। ঠিক এই সময় বুঝতে পারলো ও, পিচকারী দিয়ে রক্ত ছুটতে আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বাকি। নিচে থেকে ওর দিকে উঠে আসছে একটা গাড়ি, হেডলাইটের চোখ রাঙানি দেখে ভয়ে হিম হয়ে গেলো বুকের রক্ত।

হাত আর পা বিদ্যুৎ গতি লাভ করলো রানার। হুইল, ক্লাচ আর অ্যাকসিলারেটর নিয়ে পাগলের মতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। চোখের পলকে ঘুরে গেলো গাড়ি, ট্যুর বাসটার সামনে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা শিয়াল যেন রাস্তা পেরোচ্ছে। বাসের ড্রাইভারকে এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের জন্যে দেখলো রানা, হাঁ হয়ে আছে মুখ, চোখ দু'টো বিস্ফারিত। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

গাড়ির সামনের ফেণ্ডারটা টানেলের দেয়ালে ঘষা খেলো, মুষলধারে বৃষ্টির মতো একরাশ ফুলকি ছুটলো আগুনের, আগেই উল্টো দিকে ঘোরাতে শুরু করেছে হুইলটাকে রানা। আর একটু হলে পাশ ঘেঁষে ধাবমান বাসের পেছনের অংশে সেঁধিয়ে যেতো মার্সিডিজের সামনের একটা কোণ। আতঙ্কিত ইঁদুরের মতো টানেলের এদিক ওদিক ছুটছে গাড়ি, প্রায় দেড়শো গজ এভাবে এগিয়ে যাবার পর সেটাকে আয়ত্তে আনতে পারলো রানা। ভাগ্যিস বাসের পেছনে আর কোনো গাড়ি ছিলো না, ঢোক গিলে ভাবলো রানা।

উজ্জ্বল একটা টানা বিদ্যুতের ঝলকের মতো পিছিয়ে গেলো লেভেল 2, এক সেকেণ্ড পর ভিউমিরর হয়ে আলোর একটা ছোট্ট কণা চোখে পড়লো রানার। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর। বাসটাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে পেছনের গাড়িটাও, দ্রুত কাছে চলে আসছে আবার।

স্পীড বাড়ালো আবার রানা। তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলো টায়ারগুলো। গোটা টানেল পোড়া রাবারের উৎকট দুর্গন্ধে ভরাট হয়ে গেছে।

লেভেল ওয়ান।

সামনে একটা উজ্জ্বলতা। আরেকটা গাড়ি আসছে বুঝতে পেরে শক্ত হয়ে গেলো পেশীগুলো। কিন্তু টানেল সোজা হতেই ও দেখলো সামনে টানেলের মুখ, ভিতরে ঢুকছে দিনের আলো, গাড়ি নয়। অ্যাকসিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়ালো, টানেল থেকে কামানের গোলার মতো বেরিয়ে এলো মার্সিডিজ। টোল আদায়কারী দু'হাত শূন্যে তুলে লাফ দিয়ে সরে গেলো একপাশে, বাতাসের ঝাপটা খেয়ে দম বন্ধ হয়ে এলো তার, গাড়িটা আধ হাত দূর দিয়ে চলে গেছে।

প্রখর রোদ লেগে কুঁচকে উঠেছে চোখ দু'টো রানার। পাহাড় থেকে ড্রামেনের মেইন রোডের দিকে টপ স্পীডে নেমে যাচ্ছে গাড়ি।

পাহাড়ের নিচে পৌঁছে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ব্রেক নামিয়ে রেখে বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে রানা। বাঁক নিচ্ছে গাড়ি, উল্টে পড়ার অবস্থা এখন, আর্তনাদ করছে টায়ারগুলো, কালো রাবার রেখে যাচ্ছে রাস্তার গায়ে। পরমুহূর্তে ব্রেক প্যাডেলের উপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, সীট ছেড়ে উঠে পড়েছে। অল ক্লিয়ার নীল সিগন্যাল

দেখে একদল নিরীহ লোক রাস্তা পেরোচ্ছে। ওদেরকে বাঁচাবার জন্যে শেষ চেষ্টা করে দেখছে ও। গাড়ির পেছনটা উঁচু হয়ে উপর দিকে উঠে গেলো খানিকটা, হুইলের সাথে সেঁটে আছে রানার বুক। গাড়ির নাক নিচু হয়ে গেলো। কাজ হয়েছে ব্রেক প্যাডেলে দাঁড়িয়ে পড়ায়। ভিড়ের কয়েক ইঞ্চি তফাতে থেমেছে গাড়ি। মৃদু ধাক্কা লাগলো একজন লোকের উরুতে। রাস্তার মাঝখানে রানার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। পুলিশ।

ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা। মুখের চেহারা নির্বিকার। সীটে হেলান দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে পেছন দিকে রাস্তা বরাবর তাকালো রানা। অনুসরণরত গাড়িটাকে ব্রেক কষে আরেক দিকে বাঁক নিতে দেখছে, অন্য রাস্তা ধরে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে ড্রামেন থেকে।

জানালায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করছে আঙুল ঠুকে পুলিশটা, কাঁচ নামাতেই কানে তপ্ত নরওয়েজিয়ান ভাষার বিস্ফোরণ শুনতে পেলো রানা। এদিক ওদিক মাথা নাড়লো ও, চেঁচিয়ে বললো, 'তোমাদের ভাষা আমি বুঝি না। ইংরেজি বোঝো তুমি?'

মাঝপথে থেমে গেলো লোকটা, মুখটা এখনো খোলা। তারপর শক্তভাবে সেটা বন্ধ করে গভীর একটা শ্বাস নিলো, ইংরেজিতে বললো, 'এসবের মানে কি? কিভাবে গাড়ি চালাতে হয় জানো না?'

'আর একটু হলে জন্মের মতো ভুলিয়ে দিচ্ছিলো,' মুচকি হেসে বললো রানা। 'আমার কোনো দোষ নেই। পেছনের ওই বখাটে ছোকরাগুলোই দায়ী।'

পিছিয়ে গিয়ে খুব ধীর ভঙ্গিতে গাড়িটাকে পরখ করলো পুলিশ। ঠোঁট টিপে উপর নিচে সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো। ঘুরে গিয়ে পাশের জানালায় টোকা মারলো এবার। হাত বাড়িয়ে রানা

দরজাটা খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকলো সে। বললো, 'চালাও!'

POLISI লেখা বিল্ডিংটার সামনে গাড়ি দাঁড় করালো রানা। ইঞ্জিন বন্ধ করতেই ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে নিলো লোকটা, সামনের গেট দেখিয়ে হুকুমের সুরে বললো, 'ভিতরে!'

দীর্ঘ অপেক্ষা। একজন জুনিয়র গ্রেড পুলিশম্যানের সকৌতুক দৃষ্টির সামনে নিঃস্ব একটা কামরায় বসে আছে। মনে মনে একটা গল্প তৈরি করছে ও। সত্য প্রকাশ করলে প্রশ্ন উঠবে: ফিলাতভ নামে একজন ইসরায়েলিকে কে এবং কেন ছিনতাই বা খুন করার চেষ্টা করবে? এর পরের প্রশ্নটাই হবে: কে এই ফিলাতভ? এভাবে একের পর এক প্রশ্ন উঠবে, এবং খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না রানা, জানে ও। ফিলাতভ সম্পর্কে এখনো বলতে গেলে কিছুই জানে না ও। অর্থাৎ প্রকৃত সত্যটা আপনাআপনি বেরিয়ে আসবে ওর মুখ থেকে। পুলিশ অফিসাররা মোটেও ঘাবড়াবে না। পরিষ্কার বুঝে নেবে, বদ্ধ একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছে তারা। শুধু তাই নয় পাগলের মধ্যে খুনখারাবির প্রবণতাও আবিষ্কার করে বসবে তারা।

একঘণ্টা কাটার পর টেলিফোন বাজলো। সংক্ষেপে জবাব দিলো জুনিয়র গ্রেড। ক্রাডলে রিসিভার রেখে বুড়ো আঙ্গুল বাঁকা করে দরজা দেখালো সে রানাকে। 'চলো!'

একটা অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। ডেস্কের ওধারে একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার। একটা কলম তুলে নিয়ে সামনের একটা চেয়ারের দিকে তাক করে ধরলো সে। 'বসো!'

বসলো রানা। ভাবছে, নরওয়েজিয়ানদের একবারে একটার বেশি শব্দ উচ্চারণ করতে নিষেধ আছে কিনা। ছাপা একটা ফর্মের গায়ে কলমের আগা ঠেকালো অফিসার। 'নাম?'

'ফিলাতভ,' বললো রানা। আনাতোলি প, ফিলাতভ।'

'জাতীয়তা ?'

'ইসরায়েলি।'

হাত বাড়ালো অফিসার, রানার বুকের সামনে তালু। 'পাস-পোর্ট।'

পকেট থেকে পাসপোর্টটা বের করে তালুর উপর রাখলো রানা। উল্টেপাল্টে সেটা দেখলো অফিসার। রেখে দিলো। গ্র্যানাইট পাথ-রের মতো স্থির দু'টো চোখ। তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'ড্রামে-নের রাস্তা দিয়ে ঘণ্টায় আনুমানিক একশো চল্লিশ কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি চালিয়েছো তুমি। কাজটা বেআইনী হয়েছে, তবে এই ভেবে আমরা খুশি যে-কোনো দেয়ালের গা থেকে তোমার হাড়গোড় চেঁছে তোলার দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপেনি। ব্যাখ্যা করো। কি বলার আছে তোমার ?'

'পেছনের গাড়িটা খামোকা ঠাট্টা-মস্করা করছিলো আমার সাথে', নির্বিকারভাবে বললো রানা। দেখলো, ভুরু উপরে উঠে গেছে অফিসারের। 'আমার ধারণা বখে যাওয়া টিন এজার ছিলো ওরা, জানোই তো, কাউকে ভয় পাওয়ানোতেই যতো আনন্দ ওদের। পেছনে কয়েকবার গুঁতো মেরেছে, সেজন্যে স্পীড বাড়াতে হয়েছে আমাকে। এ থেকেই যা কিছু ঘটেছে।'

কটমট করে তাকিয়ে আছে অফিসার। রানা থামতেও চোখের দৃষ্টি বা মুখের কঠিন ভাবে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না।

নিস্তব্ধতাটুকুকে জমাট বাঁধতে দিয়ে চুপ করে থাকলো রানাও, তারপর ধীর এবং পরিষ্কারভাবে বললো, 'এই মুহূর্তে আমি ইসরা-য়েলি দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করতে চাই।'

চোখ নামিয়ে টাইপ করা একটা ফর্ম দেখলো অফিসার। 'তোমার গাড়ির পেছনের অংশের সাথে তোমার গল্পের মিল আছে। অপর গাড়িটাও আমরা পেয়েছি। খালি। গত রাতে অসলো থেকে চুরি করা হয়েছিলো ওটা।' চোখ তুলে তাকালো। 'জবানবন্দীর কোথাও কোনো রদবদল করতে চাও?'

'না।'

'ঠিক জানো?'

'ঠিক।'

পাসপোর্ট হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো অফিসার। 'এখানে অপেক্ষা করো।' বেরিয়ে গেলো অফিস থেকে।

এক ঘণ্টা পর ফিরলো লোকটা। 'তোমাদের দূতাবাস থেকে এক-জন অফিসার আসছেন। এর মধ্যে স্টেটমেন্টটা লিখে ফেলো।'

'হুঁ,' একটু চিন্তিতভাবে বললো রানা। 'আমার পাসপোর্টের ব্যাপারটা কি হবে?'

'দূতাবাসের অফিসার ওটার দায়িত্ব নেবেন। তোমার গাড়িটাকে রেখে দেয়া হবে রঙের স্পেকট্রোগ্রাফিক টেস্টের জন্যে। এক গাড়ির রঙ যদি আরেক গাড়িতে পাওয়া যায় তাহলে তোমার জবানবন্দীর সত্যতা প্রমাণিত হবে। যাই হোক, গাড়িটা এই মুহূর্তে তো আর চালানো যাচ্ছে না—দু'টো ইণ্ডিকেটর লাইটই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পাঁচশো গজও এগোতে পারবে না, আবার গ্রেফতার হবে পুলিশের হাতে।'

'অফিসার কতক্ষণের মধ্যে আসছেন?'

'বলতে পারি না। যতক্ষণ না আসে, এইখানেই অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।' অফিস ছেড়ে আবার বেরিয়ে গেলো সিনিয়র গ্রেড।

ঠুঁটো জগন্নাথের মতো ঝাড়া দু'ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে হলো রানাকে। ক্ষিদের অভিযোগ তুলতে কিছু স্যাণ্ডউইচ আর কফির সরবরাহ পেলো ও। ইতিমধ্যে একবার শুধু সরকারী ডাক্তার এসে দেখে গেছে ওকে, আর কেউ এসে বিরক্ত করেনি। কপালের বাঁ দিকের ক্ষতটা ধুয়ে ড্রেস করে দিয়ে গেছে ডাক্তার। মেঠো পথ দিয়ে ছুটে পালাবার সময় একটা গাছের ডালের সাথে ধাক্কা খেয়েছিলো। আবছা ভাবে মনে আছে কথাটা। ডাক্তার অবশ্য জানালো, আঘাত-টা পেয়েছে ও গাড়িতেই। প্রতিবাদ করলো না রানা। দেখলো, ফিলাতভের মুখের একটা পাশ বেশ গুরুতর রকম চোট খেয়েছে। কেন যেন, মনে মনে সেজন্যে একটু খুশিই হলো ও।

পাঁজরের ক্ষতটা সম্পর্কে একটা কথাও বললো না রানা। ডাক্তার বিদায় হতে দ্রুত সেটা একবার পরীক্ষা করে নিয়েছে। ছোরাটা ক্ষুরের মতো ধারালো ছিলো, সন্দেহ নেই, টপকোট, জ্যাকেট এবং সোয়েটার ভেদ করে গেছে ইস্পাতের পাত। লম্বা একটা ক্ষত, তবে তেমন গভীর নয়। সাদা সোয়েটারটা রক্তে লাল হয়ে গেছে, কিন্তু ক্ষতটা পরিষ্কার, মাংস কোথাও থেঁতলে যায়নি, রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু হঠাৎ নড়লে চড়লে ব্যথা লাগে। ঘাঁটাঘাঁটি না করে যেভাবে আছে সে ভাবেই ছেড়ে দিলো।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। প্রথমেই লোকটার বলিষ্ঠ গড়নের দিকে চোখ পড়লো রানার। ওর মতোই লম্বা। পেটা শরীর। উঁচু চওড়া কাঁধ। মুখটা নিখুঁত, এতটুকু আঁচড় নেই। চোখ দু'টো নীল। বেপরোয়া স্বভাবের লোক, দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু রানার সাথে যথেষ্ট ভদ্র আচরণ করলো।

'ডক্টর ফিলাতভ—আমি এডমণ্ড জুনেস্কি। আপনাকে ছোট্ট এই

ঝামেলাটা থেকে উদ্ধার করতে এসেছি। আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?' শেষ প্রশ্নটায় উদ্বেগের সুর।

তিন সেকেণ্ড চুপ চাপ তাকিয়ে থাকলো রানা। দূতাবাসকে ফিলাতভের সুস্থতা সম্পর্কে একটু যেন বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো ওর। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো ও।

এডমণ্ড জুনেস্কির পিছু পিছু ঢুকলো সিনিয়র গ্রেড পুলিশ অফিসার। দু'জন মিলে রানার লিখিত স্টেটমেন্ট দেখলো তারা। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলো জুনেস্কি। অফিসার একজন কনস্টেবলকে ডেকে স্টেটমেন্টটা টাইপ করতে পাঠালো।

সাত মিনিট পর টাইপ করা স্টেটমেন্টের চারটে কপিতেই সই করলো রানা। সাক্ষী হিসেবে সই দিতে হলো জুনেস্কিকে।

'চুকে গেলো ব্যাপারটা।' ছোট্ট একটা হাঁফ ছেড়ে পুলিশ অফিসারের দিকে তাকালো জুনেস্কি।

'আপাততঃ', সিনিয়র গ্রেড গম্ভীর। 'ডক্টর ফিলাতভকে আবার হয়তো দরকার পড়বে আমাদের। আশা করি, ডাকলেই তাঁর সাড়া পাবো আমরা।'

'অবশ্যই,' সহজ সুরে বললো জুনেস্কি। উঠে দাঁড়ালো। পাশে দাঁড়ানো রানার দিকে তাকালো। 'চলুন, ডক্টর, হোটেলে ফিরে যাওয়া যাক। আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

জুনেস্কির গাড়ি নিয়ে হোটেলে ফিরছে ওরা। ড্রামেন থেকে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি। জুনেস্কি চালাচ্ছে। একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা। ও যে 'ডক্টর' তা জুনেস্কি জানলো কিভাবে? পাসপোর্টে তো শুধু 'মিস্টার' লেখা আছে। নড়েচড়ে বসলো রানা। উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকালো। বললো 'হোটেলেই যদি যাচ্ছি

আমরা, আমার পাসপোর্টটা ফেরত দাও আমাকে। ওটা সাথে না থাকলে অস্বস্তি বোধ করি।'

'আপনি হোটেলে যাচ্ছেন না, ডক্টর ফিলাতভ,' বললো জুনেস্কি। 'পুলিশকে সব কথা জানাতে নেই, তাই জানাইনি। আপনি দূতাবাসে যাচ্ছেন। লণ্ডন থেকে একটু আগেই ফিরে এসেছেন মিঃ কার্ল পপকিন। আপনার সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।' মৃদু হাসলো সে। 'ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। এতক্ষণে পায়চারি শুরু করে দিয়েছেন, বাজি ধরে বলতে পারি।'

রহস্য গভীর হচ্ছে, অনুভব করলো রানা। মিঃ কার্ল পপকিনের নামটা জুনেস্কি এমন ভাবে উচ্চারণ করলো যেন এই নামের সাথে কতদিনেরই না পরিচয় ওদের! কার্ল পপকিন, কে হে তুমি বাপু?

'পপকিন!' সবজান্তার ভঙ্গিতে মৃদু শব্দে নামটা উচ্চারণ করলো রানা। আশা, লোকটা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য খালাস করবে জুনেস্কি। কিন্তু না, টোপটা গিললো না সে। বললো, 'আপনার স্টেটমেন্টে সবটুকু ঘটনা নেই, তাই না, ডক্টর ফিলাতভ? একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছে, স্পাইরেলটোপেনের ওয়েট্রেস সে—কারো সাথে একটু মারামারির মতো একটা কিছু ঘটেছে ওখানে। পুলিশও সন্দেহ করেছে, এর মধ্যে গোলমাল আছে কোথাও।'

রানা কথা বলছে না।

আড়চোখে ওর দিকে তাকালো জুনেস্কি। হাসলো। 'কিছু মনে করবেন না। পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক কাজই করেছেন সব কথা ওদেরকে না জানিয়ে। পুলিশকে কখনো পিস্তল-রিভলভারের কথা বলতে নেই, বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়ে। তবে, ডক্টর, একটা কথা না বলে পারছি না—এ ধরনের একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া মোটেই

উচিত হয়নি। মিঃ পপকিন সাংঘাতিক ক্ষেপে আছেন।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো একটা সে। 'আপনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁকে আমি দোষ দিতে পারি না।'

যতো কম কথা বলা যায় ততোই ভালো, বুঝতে পারছে রানা। সীটের পেছনে হেলান দিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিলো ও। 'আমি ক্লান্ত।'

'হ্যাঁ,' বললো জুনেস্কি। 'ক্লান্ত তো হবারই কথা।'

পাঁচ

ছোট্ট একটা সিটিং রুমে রানাকে বসিয়ে রেখে রিপোর্ট করতে বেরিয়ে গেলো এডমণ্ড জুনেস্কি। পনেরো মিনিট পর ফিরে এসে বললো, 'আমার সাথে আসুন, ডক্টর ফিলাতভ।'

কার্পেটে মোড়া লম্বা একটা করিডোরে বেরুলো ওরা। শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জুনেস্কিকে অনুসরণ করলো রানা। মেহগনি কাঠের পালিশ করা একটা দরজার সামনে দাঁড়ালো জুনেস্কি, মৃদু চাপ দিয়ে কবাট দু'টো খুললো। ভারি পর্দা ঝুলছে। 'ভয়ের কিছু নেই, যান। জানেনই তো মিঃ পপকিন কেমন মানুষ।'

ডেস্কের পেছনে যে লোকটা বসে আছে তাকে চারকোণা বলা ছাড়া তার চেহারার কোনো বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। বিশাল শরীর। চৌকো মাথা। সাদা চুল, গোল করে ছাঁটা। বুকটা অসম্ভব চওড়া, তেমনি দুই কাঁধ। মাংসল হাতে এক একটা আঙুল এক একটা সাগর কলার মতো। 'আসুন, ডক্টর ফিলাতভ,' জুনেস্কির, দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো সে। 'ঠিক আছে, জুনেস্কি, মাই বয়, নিজের কাজে যাও।'

বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো জুনেস্কি।

'বসুন ডক্টর,' কার্ল পপকিন বললো। গলার সুরে আমন্ত্রণ, হুকুম নয়।

নিঃশব্দে ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসলো রানা। চুপ করে আছে। এক এক করে অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করছে ওকে পপকিন।

আরো কয়েক মুহূর্ত পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো পপকিন। 'ডক্টর ফিলাতভ, আপনাকে অনুরোধ করা হয়েছিলো হোটেল ছেড়ে দূরে কোথাও যাবেন না, যদি বা যান, সেন্ট্রাল অসলোর বাইরে যেন ভুলেও পা না দেন। বলা হয়েছিলো, যদি দূরে কোথাও যেতে চান, আগে থাকতে আমাদেরকে খবর দেবেন, যাতে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারি।'

রানা চুপ।

গলা চড়ে গেলো পপকিনের, 'হয়তো অনুরোধ করা উচিত হয়নি, হয়তো নির্দেশ দেয়া উচিত ছিলো আপনাকে,' পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, রাগে ফেটে পড়া থেকে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে লোকটা। কণ্ঠস্বর নিচে নামিয়ে আনলো আবার সে। 'আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এ খবর পেয়ে বাকি সব কাজ

ফেলে সাত তাড়াতাড়ি চলে এলাম আমি। এসে কি শুনলাম? শুনলাম, একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়ে কি না কি ঘটিয়েছেন। কেন, কি কারণে, তা একমাত্র আপনিই জানেন।'

কথার মাঝখানে বাধাকে প্রতিহত করার জন্যে একটা হাত তুললো পপকিন। কিছু মনে করলো না রানা। কিছু বলার নেইও ওর, কিছু বলতে যাচ্ছিলোও না।

'বুঝলাম,' বললো পপকিন। 'বুদ্ধি করে স্থানীয় পুলিশকে যা বলেছেন তা ভালোই হয়েছে। গল্পটা তারা হয়তো বিশ্বাস করবে,' হাত দু'টো ডেস্কের উপর বিছিয়ে দিলো সে। 'এখন বলুন, আসলে কি ঘটেছিলো?'

'জঙ্গলের ভিতরে হাঁটছিলাম,' বললো রানা। 'হঠাৎ একজন লোক আমাকে আক্রমণ করলো।'

'বর্ণনা?'

'লম্বা। চওড়া। গড়নটা আপনার কাছাকাছি, তবে যুবক। কালো চুল। নাকটা ভাঙা। হাতে কিছু একটা ছিলো—সেটা দিয়ে ঘা মারতে যাচ্ছিলো আমার চাঁদিতে। লোহার রড হতে পারে। ভারি নিষ্ঠুর লোক, জাত দুশমনরা কেমন হয় তা তো আপনি জানেনই।'

'জাত দুশমন? মানে?'

'আমি আরবদের কথা বলছি। ওই শালারাই তো আমাদের জন্মশত্রু।'

পাঁচ সেকেণ্ড কথা সরলো না পপকিনের মুখে। অদ্ভুত এক বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে আছে সে রানার দিকে। ডক্টর ফিলাতভকে এমন আরব বিদ্বেষী ভাবাবেগে ভুগতে দেখেনি সে এর আগে।

‘যাই হোক। তারপর? কি করলেন আপনি?’

‘শুইয়ে দিলাম,’ সহজ গলায় বললো রানা।

‘শুইয়ে দিলেন!’ ভুরু কুঁচকে উঠলো পপকিনের। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে বাধছে তার। ‘কি বলছেন আপনি, ডক্টর ফিলাতভ। কিভাবে শুইয়ে দিলেন তাকে আপনি?’

‘কিভাবে আবার, ঘুসি মেরে,’ রানা শান্ত। ‘আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, এক সময় আমি বক্সিং প্র্যাকটিস করেছি।’

‘বক্সিং প্র্যাকটিস করেছেন? বলেন কি!’ চোখ কপালে উঠে গেলো পপকিনের। কিন্তু সময় নষ্ট না করে দ্রুত জানতে চাইলো, ‘তারপর? তারপর কি ঘটলো?’

‘পেছন দিক থেকে আরেকজন লোক আসছিলো, তাই দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলাম।’

‘বুদ্ধিমান—কোনো কোনো সময়, অন্তত। এরপর?’

‘আরেক লোক আমাকে বাধা দিলো সামনে থেকে।’

‘চেহারার বর্ণনা দিন।’

‘এও দুশমন। একটু বেঁটে। ছুঁচোর মতো মুখ। লম্বা, খাড়া নাক। জীন আর ব্লু জার্সি পরা। এই লোকের হাতে একটা ছোরা ছিলো।’

‘ছোরা? সত্যি নাকি?’ মৃদু ব্যঙ্গের সুরে বললো পপকিন, শোনা যাক, এ ব্যাপারটা কিভাবে আপনি সামলালেন?’

‘বলছি। পেছন থেকে আরেকজন আসছিলো কিনা, তাই চিন্তা করার বেশি সময় পাইনি, সামনের ছোরাধারী লোকটার দিকে এগিয়ে গেলাম, এবং…’ হেসে ফেললো রানা দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে যেতে।

'এবং ?'

'এবং ডামিটা বিক্রি করলাম তার কাছে, শেষ মুহূর্তে।'

'কি ? কি করলেন ?'

'আই সোল্ড হিম দ্য ডামি। রাগবী খেলার একটা কৌশল, অর্থ হলো…'

'থাক। অর্থটা আমি জানি,' দ্রুত বললো পপকিন। 'আপনি সম্ভবত এক সময় ভালো একজন রাগবী খেলোয়াড়ও ছিলেন, তাই কি ?'

'হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন।' গলার সুরে খুশি খুশি ভাব এনে বললো রানা।

মাথা নিচু করে কপালে হাত রাখলো কার্ল পপকিন যাতে মুখটা আড়াল হয়। প্রচণ্ড আবেগ দমন করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'তারপর কি ঘটলো ?' বেসুরো, বেসামাল শোনালো তার কণ্ঠস্বর।

'এর মধ্যে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি আমি—কিন্তু ওখানে আরেকজন লোক ছিলো।'

'আরো একজন ?' ক্লান্ত সুরে বললো পপকিন। 'বর্ণনা ?'

'এ লোকটা আরব নয়। নেড়ে কিনা তাও ঠিক ধরতে পারিনি…'

'নেড়ে ?'

'মানে, মুসলমান।'

'কোন্ অভিধানে পাবো শব্দটা ?'

'পাবেন না। লোকটার বর্ণনা দেয়া কঠিন। সম্ভবত খয়েরী রঙের একটা স্যুট পরে ছিলো। তার কাছে রিভলভার ছিলো একটা।'

'বুলেট ছিলো না ওটায়, তাই গুলি ছুঁড়তে পারেনি, তাই না ?' ব্যঙ্গের সুরে বললো পপকিন। গলা কাঁপছে তার। 'তা কি করলেন

এবার ?'

'গাড়িতে উঠে পড়ার পর রিভলভারটা দেখতে পাই, তাই তেমন কিছু করার সুযোগ পাইনি. শুধু তাড়াহুড়ো করে গাড়ি চালিয়ে···'

'ঘণ্টায় একশো চল্লিশ কিলোমিটার—একে আপনি স্রেফ তাড়াহুড়ো করে গাড়ি চালানো বলেন ? এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ড্রামেনের ভিতর দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে এসে একজন পুলিশের পাছায় গুঁতো মেরেছেন, কিভাবে বর্ণনা করবেন এটাকে ?'

'আপনার বর্ণনাই চলবে—ঠিক তাই ঘটেছিলো,' মৃদু স্বরে বললো রানা।

'ঠিক তাই ঘটেছিলো ?' পপকিন ভেঙচালো কিনা ঠিক ধরতে পারলো না রানা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো সে। তারপর মুখ তুলে তাকালো রানার দিকে। 'যা ঘটেছে বলে দাবি করছেন, শুনলাম। তার কতটুকু বিশ্বাস করবো নিজেই বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এবার আমি জানতে চাই, ড্রামেনে আপনি কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, এবং অসলো ত্যাগ করার সময় অনুসরণকারীদের খসিয়ে দেয়ার জন্যে অতো খাটাখাটনির পেছনে আপনার কি উদ্দেশ্য ছিলো ?'

'অনুসরণকারীদের খসিয়ে দিয়েছি ?' ব্যাপারটা বুঝলোই না রানা। 'কি বলছেন ? আমি জানতেই পারিনি কেউ আমাকে অনুসরণ করছে।'.

'এখন আপনি জানেন। আপনার নিরাপত্তার স্বার্থেই ওরা অনুসরণ করেছিলো আপনাকে। কিন্তু আমার লোকদের বক্তব্য হলো, তাদের জীবনে তারা কখনো এমন নিপুণ কায়দায় কাউকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। সম্ভাব্য সবরকম কৌশল খাটিয়েছেন আপনি। দু'বার প্রায় সফল হয়েছিলেন, তৃতীয় বার পুরোপুরি সফল হন।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।' বললো রানা। 'হু'-একবার পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ব্যস এইটুকু, এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

গভীর একটা শ্বাস নিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকালো কার্ল পপকিন। 'পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।' ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। 'ডক্টর ফিলাতভ, বলতে পারেন, তেল আবিবের চেয়ে অসলোকে অনেক ভালভাবে চেনা সত্বেও কেন আপনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন?'

দ্রুত উত্তরটা দিলো রানা। ঠিক এই ধরনের কোনো প্রশ্নের জন্যেই যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলো ও।

'কারণটা সম্ভবত এই যে আমি হয়তো ডক্টর ফিলাতভ নই।'

আঁতকে উঠলো কার্ল পপকিন, 'কি বললেন?'

ছয়

আগাগোড়া সবটা বললো রানা।

যখন শেষ হলো, কার্ল পপকিনের চৌকোণা মুখ তখন ঝুলে লম্বা

হয়ে গেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রানার প্রতিটি বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে সে। হাতের চুরুটে একবারও টান না দিয়ে নিভে যেতে দিয়েছে এবং কোনো মন্তব্য করা থেকে বহু কষ্টে নিজেকে বিরত রেখেছে। রানার কথা শেষ হতে টেলিফোনের রিসিভারটা তুললো, ডায়াল করে বললো, 'জুনেস্কি? এক মিনিটের মধ্যে স্টকটনকে এখানে আসতে বলো।'

চেয়ার ছেড়ে উঠলো দুর্ধর্ষ স্পাই সংস্থা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের স্ক্যানডিনেভিয়ান ইন-চার্জ ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) কার্ল পপকিন। ডেস্ক ঘুরে রানার পাশে দাঁড়ালো, ওর কাঁধে মৃদু চাপড় মারলো দু'বার। 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন জরুরী একটা কাজ সেরে আবার আমি আসছি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোলো দরজার দিকে। সামনাসামনি পড়ে গেলো একজনের সাথে, এইমাত্র ঢুকেছে লোকটা। 'এই যে উইলিয়াম,' হাসলো পপকিন, কিন্তু তা পলকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো মুখ থেকে। চাপা স্বরে কিছু বললো সে উইলিয়াম স্টকটনকে। তারপর বেরিয়ে গেলো কামরা থেকে।

করিডোরে থামলো পপকিন। পকেট হাতড়ে চুরুটের প্যাকেট বের করলো। ধরাবার সময় লক্ষ্য করলো দু'টো হাতই কাঁপছে তার।

নেতিবাচক ভঙ্গিতে আপন মনে মাথা নাড়লো। তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো একটা দরজার সামনে। নক করে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলো না, কবাট খুলে ঢুকে পড়লো ভিতরে।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বসকে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো এডমণ্ড জুনেস্কি। 'স্যার!'

মাথা নিচু করে এগোলো পপকিন, জুনেস্কির কথা যেন শুনতেই পায়নি। পেছনে ধোঁয়ার মেঘ ছাড়তে ছাড়তে সোজা এগিয়ে এসে

টেবিলের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসলো। 'আমাদের ফিলাতভ কমপ্লিটলি পাগল হয়ে গেছে, জুনেস্কি। অতিরিক্ত প্রতিভাবানদের নিয়ে এই জন্যে আমি কাজ করতে পছন্দ করি না। পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ওদের সবচেয়ে বেশি।'

'ডক্টর ফিলাতভ? পাগল?'

'হ্যাঁ, ডক্টর ফিলাতভ, পাগল,' প্রায় ভেঙচে উঠলো পপকিন। 'শুধু পাগল হয়নি, আমাকেও পাগল করার ব্যবস্থা করেছে! কি জবাব দেবো এখন আমি হেডকোয়ার্টারকে? দু'বছর পর রিটায়ার করতে যাচ্ছিলাম, সব চুলোয় যেতে বসেছে। গায়ের চামড়াটা বাঁচবে কিনা·· যা সন্দেহ করছি তা যদি সত্যি হয়, জুনেস্কি, আই হ্যাভ টু কমিট সুইসাইড। অযোগ্যতার শাস্তি, সে যে কি ভয়ঙ্কর—তার চেয়ে আত্মহত্যা করা···'

'স্যার, স্যার, আপনি শান্ত হোন,' ব্যাকুল কণ্ঠে বললো জুনেস্কি। 'কি হয়েছে···'

'তবে শোনো।' পপকিন বলতে শুরু করলো।

সব কথা শেষ করে রাগে কাঁপতে লাগলো পপকিন। 'রহস্যময় আক্রমণকারীদের কথা অবিশ্বাস্য। তবে, একথা ঠিক, স্পাইরালেনের মাথায় এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে ফিলাতভ নিজেকে চিনতে পারছে না। ওর মানসিক স্থিতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে একজন চিকিৎসক দরকার আমাদের।' দেয়ালের দিকে তর্জনী তাক করলো সে। 'ওখানে যে রয়েছে সে মানুষ নয়, জুনেস্কি। ওর কথা শোনার সময় আমি কেঁপেছি, আমার রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।'

'যা বলছে সব সত্যি, এমন হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই না?' ধীর ভঙ্গিতে জানতে চাইলো জুনেস্কি।

'নেই। কোনো সম্ভাবনা নেই। তেল আবিবে সর্বশেষ ফাইন্যাল ব্রিফিংয়ের সময় ফিলাতভ আমার সামনে বসে ছিলো। পরপর দু'-দিন। না, জুনেস্কি, কোনো সন্দেহ নেই—এ লোক ফিলাতভ। আমি যেমন কার্ল পপকিন, ও তেমনি আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভ।'

'একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে,' জুনেস্কি বললো, 'ড্রামেনের পুলিশ স্টেশনে ওর সঙ্গে যতক্ষণ ছিলাম, নরওয়েজিয়ান ভাষায় একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। অথচ, ভাষাটা ও জানে।'

'শুধু জানে না, খৈ ফোটাতে পারে।'

'অথচ, পুলিশকে প্রথম কথাটাই ও বলেছে, নরওয়েজিয়ান ভাষা জানা নেই ওর।'

'ফর গডস সেক,' বললো পপকিন। 'লোকটার পুরো ইতিহাস তুমিও জানো। ফিনল্যাণ্ডে জন্ম, সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত ওখানেই ছিলো, তারপর অসলোতে বসবাস করতে আসে। চব্বিশ বছর বয়সে তেলআবিবে চলে যায়, তারপর থেকে ওখানেই ছিলো। তার মানে বাইশ বছর। জীবনে কখনো রাগবী খেলা তো দূরের কথা, রাগবী বল চোখেও দেখেনি। কিভাবে মুঠো পাকাতে হয় তাই জানে না, বক্সিং প্র্যাকটিসের তো প্রশ্নই ওঠে না। ওর ডোশিয়ারে পরিষ্কার লেখা আছে, সাংঘাতিক ভীতু লোক, কেউ চোখ রাঙালে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দেয়।'

'বক্সিং, রাগবী এবং মারপিট সম্পর্কে যা বলার তা যদি সত্যি হয়, তাহলে এ লোক ফিলাতভ নয়,' চিন্তা করার জন্যে বিরতি নিলো জুনেস্কি, তারপর বললো, 'স্পাইরালটোপেনের প্রত্যক্ষদর্শী... একজন লোককে সে মার্সিডিজের পাশে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।'

'আতঙ্কে অস্থির একজন ওয়েট্রেস, কি দেখতে কি দেখেছে,' বিরক্তির সাথে বললো পপকিন। 'আচ্ছা, থামো এক মিনিট—ফিলাতভকে ব্যাপারটা বলেছো নাকি তুমি?'

'বলেছি, স্যার।'

'মিলে যাচ্ছে,' বললো পপকিন। 'ফিলাতভ পুলিশকে যা বলেছে তা বর্ণে বর্ণে সত্যি হলে আমি আশ্চর্য হবো না। একদল বখাটে ছোকরা ভয় পাওয়াবার চেষ্টা করেছিলো।'

'কিন্তু রিভলভারটা?'

'রিভলভারের কথা তোমার কাছ থেকে জেনেছে। জেনেই নিজের গল্পের সাথে নিপুণভাবে বুনে নিয়েছে, তার সাথে ফোঁড়ন দিয়েছে আরো কিছু, যেমন ছোরা, লোহার রড। আসলে কি জানো, প্রকৃতিগত ভাবে অসহায় আর দুর্বলচেতা লোক তো, তাই নিজের যা হতে পারা উচিত বলে কল্পনা করেছে তাই সত্য ঘটনা হিসেবে চালাবার চেষ্টা করছে। এমন হয়।'

জুনেস্কি যুক্তিটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু প্রসঙ্গটা নিয়ে বসের সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হবারও ইচ্ছা হলো না তার। 'ফিলাতভ নয়, বলছে। কে তবে ও? কি নাম বলছে নিজের?'

'মাসুদ রানা। বলছে, বাংলাদেশে, তদানীন্তন ব্রিটিশ উপমহাদেশের পুর্ববঙ্গে জন্ম। জন্মসূত্রে বাঙালী ইহুদি। কিন্তু বর্তমানে ইসরায়েলি সিটিজেন।'

'ঠিকানা?'

'জাফার একটা ফ্ল্যাট। রাস্তার নাম মনে নেই, নাম্বার মনে নেই।' টেবিলে ঘুসি মারলো পপকিন। 'যাই বলো, প্রাণ বাজি ধরে বলতে পারি ও ফিলাতভ, ফিলাতভ, ফিলাতভ। আর কেউ হতে

পারে না।' হঠাৎ কৌতূহলী দেখালো তাকে। 'মিস জুলি,' বললো সে, 'ফিলাতভের সাথে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা তার। তার কিছু বক্তব্য পেয়েছো?'

'গতরাতের রিপোর্টে জানিয়েছে সকালে অসুস্থতার অজুহাতে তার সাথে দেখা করেনি ফিলাতভ। সারাটা সকাল সে নাকি বিছানায় ছিলো।'

'আসলে ছিলো?'

'হ্যাঁ।'

'অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি জুলির?'

'নগণ্য। ঠাণ্ডা লেগেছে, আর সিগারেট ছেড়ে টোবাকো পাইপ ধরেছে।'

'কালকের আলোচ্য বিষয় কি ছিলো ওদের?'

'নৈতিক দর্শন।'

'ফিলাতভের সাথে মিলে যাচ্ছে,' পপকিন হাত ঘষছে গালে। 'বুঝুক আর নাই বুঝুক, দর্শন নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। নাহ্, এ ফিলাতভ না হয়েই যায় না। মেরিটোরিয়াস নিরীহ টাইপের মানুষ—সেজন্যেই এই অপারেশনে তাকে নিলে উটকো কোনো গোলমাল দেখা দেবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু···আচ্ছা, তুমি কি মনে করো চারজন ছোরা আর রিভলভারধারী লোকের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে পারবে ফিলাতভ? এখানেই খটকা লাগছে। ওর ডোশিয়ার বলছে কারো গায়ে আঙ্গুলের টোকা মারতেও অক্ষম এই লোক।'

জুনেস্কি চিন্তিত। 'অপারেশনের কি অবস্থা হবে এখন?'

'ফিলাতভ যদি সত্যি পাগল হয়ে গিয়ে থাকে,' রুমাল দিয়ে

মুখের ঘাম মুছলো পপকিন। 'অপারেশন চুলোয় গেছে। আমিও। ফিলাতভকে বাদ দিয়ে অপারেশনের কথা ভাবা যায় না। জাহান্নামে যাক অপারেশন। আমি নিজের কথা ভাবছি। কি জবাব দেবো হেড-কোয়ার্টারকে ?'

'এখুনি একবার...'

'পাগল হয়েছো!' আঁতকে উঠলো পপকিন। 'ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নিই আগে। হেডকোয়ার্টারকে এই মুহূর্তে কিছুই আমি জানাচ্ছি না। যখন পরিষ্কার বুঝবো নিজের কপালে গুলি করা ছাড়া উপায় নেই কেবল তখনোই জানাবো ওদেরকে। চলো, নিজের চোখে একবার দেখো পাগলটাকে!'

করিডোরে বেরিয়ে এলো ওরা। নিজের অফিসের সামনে থামলো পপকিন, জুনেস্কির একটা হাত ধরে বাধা দিলো তাকে। 'সাবধান। গোটা পরিস্থিতিটা সাংঘাতিক নাজুক, যে-কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে!'

ভিতরে ঢুকে ওরা দেখলো ফিলাতভ তখনো তার চেয়ারে বসে আছে। চুপচাপ। তার বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে বসে আছে উইলিয়াম স্টকটন, কিন্তু তার দিকে কোনো খেয়ালই নেই ফিলা-তভের।

মুখ তুলে তাকালো স্টকটন। কাঁধ ঝাঁকালো।

সামনে এগিয়ে গেলো পপকিন। 'ডক্টর ফিলাতভ, আমি দুঃখিত...'

'আমার নাম মাসুদ রানা,' বললো রানা, 'আমি বাংলাদেশী ইহুদী। বর্তমানে ইসরায়েলের নাগরিক। এসব তো আগেই আপনা-কে আমি বলেছি।'

পনেরো সেকেণ্ড কথা বললো না পপকিন। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো সে। 'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন। আমি মনে করি আপনাকে দেখার জন্যে একজন ডাক্তারকে সুযোগ দেয়া উচিত। সে ব্যবস্থাও আমি করেছি।'

'ভেরি গুড,' বললো রানা। 'আরো আগে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো। ক্ষতটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে।'

'ক্ষত?'

ট্রাউজারের নিচে থেকে টেনে বের করলো রানা সোয়েটারটা। 'এই যে, ছোরার আঘাতটা। দেখুন না।'

পপকিন এবং জুনেস্কি একযোগে ঝুঁকে পড়লো। সিকি ইঞ্চি গভীর একটা কাটা দাগ। ষোলোটা সেলাই লাগবে চামড়া জোড়া দিতে, অনুমান করলো পপকিন।

একযোগে মাথা তুললো ওরা। অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকালো। তাকিয়ে থাকলো অনেকক্ষণ।

জট পাকিয়ে গেছে সব।

সাত

জুনেস্কির অফিসে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে পপকিন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জানালার সামনে দাঁড়ালো। জানালার

বাইরে হাত বের করে দিয়ে নিঙড়ে ঘামের কিছু ফোঁটা ঝরালো রুমালটা থেকে। তারপর আবার শুরু করলো পায়চারি। 'বিশ্বাস করি না।' কর্কশ শোনাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। কার উপর যেন আক্রোশে ফুঁসছে। 'এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।'

বিশাল শরীরটা চরকির মতো আধপাক ঘুরে গেলো, মুখোমুখি হলো সে জুনেস্কির। 'ধরো, আজ রাতে বিছানায় গেলে তুমি, এই-খানে এই অসলোয়, ঘুম ভাঙলো তোমার আগামীকাল, ধরো, নিউইয়র্কের একটা হোটেলে, আয়নায় দেখলে মুখটা অন্য কারো, তোমার নয়। কি হবে তোমার মনের অবস্থা?' টেবিলের কাছে এসে ঝুঁকে পড়লো জুনেস্কির দিকে।

কপালে চিন্তার রেখা জুনেস্কির। 'কল্পনা করতে পারি না, ভয় লাগছে। সন্দেহ নেই, পাগল হয়ে যাবো,' বললো জুনেস্কি।

'কিন্তু লোকটা পাগল হয়নি। সমস্ত দিক ভেবে দেখো, বলতে গেলে পুরোপুরি সুস্থ এবং শান্ত দেখাচ্ছে ওকে।'

'ও যদি সত্যি মাসুদ রানা হয় তাহলে,' বললো জুনেস্কি। একটু ভাবলো সে। তারপর বললো, 'কিন্তু ও যদি ফিলাতভ হয়ে থাকে তাহলে কি ওকে আপনি সুস্থ বা শান্ত বলবেন, স্যার?'

রাগে ফেটে পড়লো পপকিন। 'ফর গডস সেক। ও রানা একথা প্রমাণ করার জন্যে এতক্ষণ তুমি আমার সাথে তর্ক করেছো, এখন আবার মত পাল্টে বলছো, ও ফিলাতভও হতে পারে!'

'আমি সম্ভাবনার কথা বলছি, স্যার,' মৃদু কণ্ঠে বললো জুনেস্কি। কেন যেন, সমস্যাটার বিদঘুটে চেহারা অনুভব করতে পেরে দুশ্চিন্তার সাথে সাথে কিছুটা মজাও লাগছে ওর। 'সে যাই হোক, আঁতুড় ঘরে থাকতেই পটল তুলেছে অপারেশনটা, এ ব্যাপারে কোনো

সন্দেহ নেই।'

'একটা কথার সাফ জবাব দাও আমাকে,' সিধে হয়ে দু'কোমরে হাত রাখলো পপকিন। 'কে ও? ফিলাতভ? নাকি ফিলাতভ নয়?'

'ফিলাতভ। চেহারাটা তো...'

'ফিলাতভ একশো চল্লিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাতে পারে?' প্রচণ্ড ধমকের সুর পপকিনের গলায়।

'না।'

'সে কাউকে আহত করতে পারে? তার পক্ষে সম্ভব?' গলা আরো চড়ছে পপকিনের।

'না,' ভয়ে ভয়ে বললো জুনেস্কি। ঢোক গিললো।

'ফিলাতভ নরওয়েজিয়ান ভাষা জানে?' গম গম করে উঠলো পপকিনের কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ।'

'ফিলাতভ অসলোর পথে হারিয়ে যেতে পারে?'

'না।'

তেড়ে প্রায় মারতে এলো জুনেস্কিকে এবার পপকিন। 'তাহলে ওকে ফিলাতভ বলছো কেন?'

'ভুল করেছি,' মাথার চুলে আঙ্গুল চালাচ্ছে জুনেস্কি। বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'ও ফিলাতভ নয়।'

'নয়?' বোমা পড়লো কামরার ভিতর।

কেঁপে উঠলো জুনেস্কি।

'নয়?' প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিলো পপকিন টেবিলের উপর। চিড় ধরে গেলো কাঁচে। 'আবার বলো কথাটা। ও ফিলাতভ নয়?'

এমন উৎকট সমস্যায় জীবনে কখনো পড়েনি জুনেস্কি। দু'হাত

এক করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করলো সে। 'দুঃখিত, স্যার। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আপনি আমাকে মাফ করে দিন।'

কপালের ঘাম মুছছে পপকিন। পায়চারি শুরু করলো আবার। মাথায় তারও কি ছাই ঢুকছে কিছু। হঠাৎ থামলো, 'শোনো, এ লোক ফিলাতভ। কিন্তু পাগল হয়ে গেছে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' কিন্তু তার মুখ দেখে জুনেস্কি বুঝলো, ব্যাখ্যাটা বসের নিজের কাছেই গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

কিন্তু সাময়িক নিষ্কৃতি পাবার জন্যে উৎসাহের ভাব দেখালো সে। 'তাই হবে। নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে ডক্টর ফিলাতভ।'

'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠলো পপকিন। আবার পায়চারি শুরু করলো সে। 'ও যা ঘটিয়েছে তা কোনো পাগলের পক্ষেও সম্ভব নয়।' হঠাৎ দাঁড়িয়ে মেঝেতে পা ঠুকলো। 'কিছুই বুঝছি না। কিছুই ঢুকছে না মাথায়। একটা পাগলকে এমন ধীরস্থির দেখায় না কখনো, দেখাতে পারে না। না, পাগল নয় লোকটা। যা বলছে তাই ও? মাসুদ রানা? অসম্ভব! তাও হতে পারে না। তবে?' জুনেস্কির দিকে বোকার মতো চেয়ে থাকলো সে।

পুরো এক মিনিট কথা বললো না কেউ। ক্লান্ত, ঝড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে পপকিনকে। ধপ্ করে চেয়ারে বসলো সে। করুণ সুরে বললো, 'এক গ্লাস পানি!'

'এখানে ওকে রাখা চলে না,' বসের পানি খাওয়া শেষ হতে বললো জুনেস্কি।' 'ঠিক যে কারণে ফিলাতভকে দূতাবাসে রাখা যায়নি। দূতাবাসের ওপর সবার নেক নজর আছে।'

'ইতিমধ্যে দু'ঘণ্টার ওপর পেরিয়ে গেছে,' চিন্তিতভাবে বললো পপকিন। মুখের ঘাম মুছছে ভিজে রুমাল দিয়ে। 'হোটেলে ফেরত

পাঠিয়ে দেবো, বলছো তুমি ?'

'কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করে,' বললো জুনেস্কি। 'জুলির সাথে ওর নাকি ডিনার খাবার কথা রাতে।'

'জুলি। ওর ব্যাপারে কিছু জানে লোকটা ?'

'না।'

'না জানাই ভালো। জুলিকে খবর দাও। কিন্তু সেও যেন এ ব্যাপারে কোনো আভাস না পায়। ওর নিজের চোখে যদি কিছু ধরা পড়ে, নিশ্চয়ই রিপোর্ট করবে এবং সেটাই আমি চাই। শুধু বলবে, কোনমতেই যেন চোখের বাইরে যেতে না দেয়।' একটুকরো কাগজ টেনে নিয়ে নিজের সামনে রাখলো, কলম খুলে কাজের সংখ্যা লিখতে শুরু করলো। এরপরই দু'জন ডাক্তার দরকার আমাদের। নিজেদের লোক হওয়া চাই। একজন প্লাস্টিক সার্জেন, আরেকজন সাইকিয়াট্রিস্ট।'

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বললো জুনেস্কি।

'ঠিক,' বললো পপকিন, তারপর চুপ করে গেলো। গভীরভাবে কিছু ভাবছে। ধীরে ধীরে একসময় মুখ তুললো সে। উদ্বেগ আর আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে গেছে মুখের চেহারা। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠলো একবার। 'আর যদি একটা নকলই সরবরাহ করা হয়ে থাকে, কিভাবে তা হয়েছে, কিছু অনুমান করতে পারো ?'

'তা পারি,' বললো জুনেস্কি। 'গতকাল ভোর চারটে পর্যন্ত ফিলাতভের সাথে ছিলো জুলি। যা কিছু হয়েছে, ও চলে আসার পর। নকল, মানে, রানাকে নিয়ে আসা হয়েছে হোটেলে—কি-ভাবে ?'

'স্ট্রেচারে তুলে—নিশ্চয়ই ওর তখন জ্ঞান ছিলো না।'

'রাইট।' উৎসাহিত হয়ে বললো জুনেস্কি। সাথে সাথে দপ করে নিভেও গেলো উৎসাহটুকু। বোকা বোকা দেখাচ্ছে তাকে। চেয়ে আছে বসের দিকে।

ব্যাপারটা ধরতে পেরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো পপকিন। 'ফিলাতভ, আসল ফিলাতভ, আমাদের ডক্টর ফিলাতভ তাহলে কোথায়? কাদের হাতে?'

'সম্ভবত,' ঢোক গিলে বললো জুনেস্কি, 'রানাকে যারা হোটেলে রেখে গেছে তারাই ডক্টর ফিলাতভকে হোটেল থেকে নিয়ে গেছে। কোথায়—এ প্রশ্ন এখন তুলে কোনো লাভ নেই। সময়ে হয়তো সব রহস্যই প্রকাশ পাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে ওসব কথা ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

একটু যেন স্বাভাবিক হলো পপকিন। 'সান্ত্বনা এইটুকুই, বুঝলো জুনেস্কি ডক্টর ফিলাতভ যদি অন্য কারো হাতে পড়েও যায়, তাকে দিয়ে ওদের মনের আশা পূর্ণ হবে না।'

'স্যার, আপনার কথা ঠিক…'

আপন মনে হাসলো পপকিন। 'অপারেশনটাকে সফল করার জন্যে যে সব তথ্য দরকার তার সবটুকু তারও জানা নেই।'

হঠাৎ উত্তেজিত দেখালো জুনেস্কিকে। 'তাহলে আমরা ভাবছি কেন অপারেশন চুলোয় গেছে, স্যার? নকল হোক বা আসল হোক চেহারাটা তো ডক্টর ফিলাতভেরই?'

'তুমি একটা বুদ্ধু,' গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলো পপকিন। 'কে ও? চেনো ওকে?'

ধমক খেয়ে নয়, নিজের বোকামিটা বুঝতে পেরে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো জুনেস্কি।

'গতকাল হোটেলে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকেছে কিনা খোঁজ নাও। নতুন বোর্ডারদের নামের তালিকাও যোগাড় করো। পুরো হপ্তা জুড়ে কারা এসেছে, কারা গেছে চেক করো। নিশ্চয়ই ফিলাতভের ওপর বেশ ক'দিন থেকেই নজর রাখা হচ্ছিলো।'

'বড় ঝামেলার কাজ,' মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললো জুনেস্কি। 'স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা নেবো কি?'

'এখন? এই অবস্থায়? না। গোটা ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছি আমরা।' কাগজের বুকে কলমের আঁচড় কাটছে পপকিন। 'আমাদের মনে রাখতে হবে, পিন খোলা হাত বোমা নিয়ে ডিল করছি আমরা। বেশি ঘাঁটাতে চাই না আমি। এই লোকের দায়িত্ব এখন আমি ছেড়ে দেবো একজন সাইকিয়াট্রিস্টের ওপর। আমি এখনো বিশ্বাস করি, এ লোক ফিলাতভ। তবে···হয়তো পাগল হয়ে গেছে। পুরোপুরি হয়তো নয়···ভুল কোনো প্রশ্ন করলে, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতে পারে সে। জুনেস্কি, এক্ষুণি এই মেসেজটা লণ্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। ডাক্তারদেরকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দূতাবাসে দেখতে চাই আমি।' খস খস করে মেসেজ লিখতে শুরু করলো পপকিন।

লেখা শেষ করে চিরকুটটা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালো পপকিন। 'রানার ওপর নজর রাখার জন্যে লুইস পাঞ্জার, আয়ান, গিবসন, মেটকাফ এবং ভিক্টোরকে পাঠাও। ওদেরকে বলে দেবে, লোকটা যদি কোনভাবে পালাতে পারে বা খুন হয়ে যায়—ওদেরকে আর কখনো আমার দরকার হবে না। একথা বললেই অর্থটা ওরা বুঝবে।'

'ইয়েস, স্যার।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ থামলো পপকিন। ঘুরলো। 'আমি লণ্ডনে যাবার পর কোনো চিঠি আসেনি? আমার নামে?'

'এসেছে, স্যার,' বললো জুনেস্কি। 'তেল আবিব থেকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে। ফার্স্ট সেক্রেটারি আমাকে দিয়েছেন, সেগুলো আমি আপনার ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি।'

'হেড অফিস থেকে কোনো চিঠি?'

'বলতে পারি না, স্যার। নেড়েচেড়ে দেখিনি আমি।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো পপকিন, 'ভেবে দেখো, এসব কিছুই ঘটতো না, যদি আগেই রওনা হয়ে যেতে পারতাম আমি ফিলাতভকে নিয়ে। সব ঠিকঠাক, এমন সময় অর্ডার এলো—ওয়েট। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করো। কোথায় সেই পরবর্তী নির্দেশ? যত্তোসব!' মেঝেতে পা ঠুকে রাগের, দুঃখের, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটালো পপকিন। গট গট করে বেরিয়ে গেলো।

আট

দূতাবাস থেকে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জুনেস্কি রানাকে। গাড়িটা দূতাবাসেরই, চালাচ্ছে জুনেস্কি। ওদের নির্দেশ অমান্য করলে

কতটুকু বিপদ ঘটতে পারে তার একটা চিত্র তুলে ধরে সাবধান করে দিয়েছে সে রানাকে। 'আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন, অসাধারণ একটা গোলক ধাঁধার মাঝখানে হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি ব্যাপারটা ফয়সালা করার। এটাকে নির্দেশও বলতে পারেন, আবার অনুরোধও বলতে পারেন, আমাদেরকে না জানিয়ে হোটেলের বাইরে যাবেন না।' গলার স্বরটা কঠিন হয়ে গেছে ভেবে একটু হেসে পরিবেশটাকে তরল করতে চেষ্টা করলো সে। 'আপনার ক্ষতটা এখন কেমন ? ব্যথা কমেছে ?'

'কমেছে,' বললো রানা। 'কিন্তু যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার-কে দেখানো দরকার।' ক্ষতটা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে জুনেস্কি, কয়েকটা ট্যাবলেটও খেতে দিয়েছে ওকে। ডাক্তার না হয়েও নিপুণ-ভাবে কাজটা করেছে সে, তাই দেখে ধারণা করেছে রানা, ছোরা-ছুরির আঘাত দেখতে বা নাড়াচাড়া করতে রীতিমতো অভ্যস্ত সে, এসব তার কাছে নতুন কিছু নয়। কোথায়, তা ঠিক মনে করতে না পারলেও, লোকটার সাথে ওর নিজের যেন একটা মিল আছে, এটা স্পষ্টভাবে অনুভব করেছে ও।

'ডাক্তার আপনাকে দেখবে,' বললো জুনেস্কি। 'আগামীকাল।'

'সেই মেয়েটার সাথে একটা ডিনার ডেট আছে আমার,' বললো রানা। 'কি করবো এখন আমি ?'

'কি করবেন মানে ?'

'ফর গডস সেক! আমি তো ওর নামও জানি না।'

রানার পিঠ চাপড়ে দিলো জুনেস্কি। 'চিন্তার কিছু নেই। কোনো অসুবিধে হবে না।'

'ফিলাতভ হিসেবে অভিনয় করে যেতে বলছো তোমরা, দেশের স্বার্থে রাজি আছি আমি, কিন্তু কিছু প্রশ্নের উত্তর তো তোমরা দিতে পারো। যেমন ধরো—কে লোকটা? এই ডক্টর ফিলাতভের কথা বলছি। কে সে?'

'আপনার সমস্ত কৌতূহল আগামীকাল মেটানো হবে।'

শেষ চেষ্টা করলো রানা। 'দেখো, তোমরা খামোকা আমাকে অন্ধকারে রেখেছো। আমি তো আর তোমাদের পর কেউ নই। তোমরাও ইহুদি, আমিও ইহুদি। তোমরা ইসরায়েলি, আমিও ইসরায়েলি তোমরা দেশকে ভালবাসো, আমিও দেশকে ভালবাসি।' আবেগে কাঁপছে রানার গলা।

'অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠলো জুনেস্কি। এটা যদি অভিনয় হয়ে থাকে; ভাবছে সে, তাহলে স্বীকার করতে হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এই লোক।

'সব কথা আমাকে খুলে না বলার কি কারণ থাকতে পারে?' বিস্মিত প্রশ্ন রানার গলায়। 'তোমরা কি ইন্টেলিজেন্সে আছো? তুমি একজন স্পাই? আমিও কি তাই?'

একটু বড় হলো জুনেস্কির চোখ জোড়া। কিন্তু মুখ খুললো না। ভাবছে, মর জ্বালা, এ কেমনতরো ল্যাঠা রে বাবা! লোকটা যে বুদ্ধিমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক ঠিক কিভাবে যে সব বুঝে যাচ্ছে, গড নোজ।

হোটেল কামরায় ঢোকার পর দশ মিনিটও কাটেনি, ওকে চমকে দিয়ে বেজে উঠলো টেলিফোনটা। কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। তাকিয়ে আছে গম্ভীর মুখে। কয়েকবার বাজতে দিলো। সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছে, এই ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ধরলো

রিসিভারটা। কানের কাছে তুললো। 'ইয়েস?' রুক্ষ, নিরস কণ্ঠস্বর।

'হ্যানসেন বলছি।'

'কে?' সাবধানে জানতে চাইলো রানা।

'জুলি হ্যানসেন, আবার কে? আমরা ডিনার খাবো, মনে আছে? কেমন আছো, ডারলিং?'

একটা পুলক অনুভব করছে রানা। চকিতে মনে পড়ে গেছে রক্তকেশী মেয়েটার উত্তুঙ্গ, উপচানো, ঢলঢল যৌবনের কথা। ওর কণ্ঠস্বর কানে ঢোকা মাত্র শরীরে একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করছে। কণ্ঠস্বরে, এবং উচ্চারণ-কৌশলে অদ্ভুত একটা সেক্সি ভাব আছে মেয়েটার। 'এখন একটু ভালো,' ঢোক গিলে বললো রানা।

'ডিনার খেতে নামতে পারছো তো?'

'বোধহয়।'

'তবে ডারলিং, অসুস্থ শরীরটাকে বেশি খাটানো বোধহয় উচিত্ হবে না। আমি বলি কি, তোমার হোটেলের নিচের রেস্তোরাঁতেই তো আমরা ডিনার খেতে পারি। তুমি কি বলো?'

প্রস্তাবটা রানাই দিতে যাচ্ছিলো। এককথায় রাজি হয়ে গেলো ও।

'এক্ষুণি তাহলে তোমার রূমে চলে আসছি আমি, কেমন, ডারলিং?'

একটু থতমত খেলো রানা। 'আমার রূমে?' মৃদু গলায় বললো।

কয়েক সেকেণ্ড কথা বললো না জুলি। যখন কথা বললো, পরিষ্কার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেলো গলার স্বরে, 'এখনো রাগ করে আছো, আস্তন? যা ঘটেছে, ভুলে যাও, প্লিজ। আমি মাফ চাইছি। 'ঠিক

আছে, সুদে আসলে সব পাওনা আদায় করে নিও। আজ তোমার জন্যে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। যা বলবে, যেভাবে বলবে—যতো কষ্টই হোক, সব মুখ বুজে সহ্য করবো। খুশি?'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' বললো রানা।

'বুঝতে পারছি সাংঘাতিক ক্ষেপে আছো আমার ওপর। ঠিক আছে, আসতে দাও আমাকে—দেখবো, কিভাবে আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারো তুমি। আসছি কিন্তু।'

'না,' বললো রানা। 'ঠিক সাড়ে সাতটায় আসছো তুমি। আমি একটু একা থাকতে চাই।'

'আস্তন!' ভয় পেয়ে গেছে জুলি। 'কি আমার অপরাধ? কেন ···কেন···?'

রিসিভার রেখে দিলো রানা। রিস্টওয়াচ দেখলো। সাড়ে চারটে।

গোটা ব্যাপারটার মধ্যে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে রানা। সেই সাথে অনুভব করছে এর সাথে জড়িত আছে ওর মাতৃভূমি, খোদ ইসরায়েলের বিরাট কোনো স্বার্থ। কিন্তু কি সেই স্বার্থ? ওর চেহারা বদলে দিয়ে কি উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইছে কর্তৃপক্ষ? কর্তৃপক্ষ? নিশ্চয়ই! তেলআবিবের মেন ব্রেনগুলো রয়েছে এর পেছনে, তা না হয়েই যায় না। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যটা কি? ওকে দিয়ে দেশের কি স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইছে তারা?

পপকিন ছাই পাঁশ কিছুই জানে না, বুঝতে পেরেছে ও। স্পাইরালেনের মাথায় যা ঘটেছে, বিশ্বাস করেনি সে, সেজন্যেই নিজের পরিচয় যতটুকু জানা আছে ওর, প্রকাশ করে দিয়েছে। শুনে জ্ঞান হারাতেই শুধু বাকি রেখেছে পপকিন।

কিন্তু, কে লোকটা? জুনেস্কির বস, বোঝা যায়, কিন্তু এটুকু বুঝেও বেশি দূর এগোনো যাচ্ছে না—প্রশ্ন ওঠে, জুনেস্কি কে? অসলোর ইসরায়েলি দূতাবাসে কঠোর চরিত্রের ছোট্ট এই দলটা কি দায়িত্ব পালন করছে, কোন্ কাজে তারা নিবেদিত? ট্রেড রিলেশন? উঁহু, মনে হয় না। ফিলাতভকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো, সে যেন হোটেল ছেড়ে দূরে কোথাও না যায়। এই সাবধানতার প্রয়োজন ছিলো। স্পাইরালেনের ঘটনার পর প্রমাণ হয়েছে ব্যাপারটা। কে এই ফিলাতভ, এতো যার গুরুত্ব?

হঠাৎ বন্ করে ঘুরে গেলো মাথাটা। টেবিল ধরে সামলে নিতে চাইলো নিজেকে রানা। কামরাটা ঘুরছে। মনের ভিতর সাংঘাতিক একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। কি যেন মনে পড়তে চাইছে, কিন্তু মনে পড়ছে না। অসুস্থ বোধটা ক্রমেই বাড়ছে। অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে, বিছানার দিকে যাওয়া উচিত ওর। টেবিলের কিনারা থেকে হাত তুলে নিতেই টলে উঠলো শরীর। পড়ে যাচ্ছে রানা। কোনো শব্দ হচ্ছে না, অথচ কানের পাশে তীব্র ঝড়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছে ও। টলতে টলতে বিছানার দিকে এগোচ্ছে। হাত দু'টো অন্ধের মতো নাড়ছে সামনে। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। পড়ে গেলো রানা। তারপর আর কিছু মনে নেই।

চেতনা ফিরতেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো রানা। ঘামে নেয়ে উঠেছে।

দরজাটা ভেঙে ফেলবে নাকি? বিছানা থেকে নামতে নামতে ভাবলো ও। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছলো মুখের।

দরজা খুলে দিতেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো জুলি রানার বুকে। একটা হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে দরজাটা দ্রুত বন্ধ করে দিলো সে,

কিন্তু পলকের জন্যে করিডোরে উদ্বিগ্ন মুখ দেখতে পেলো রানা জুনেস্কির।

'আস্তন! আস্তন! কি হয়েছে তোমার?' জুলি শক্ত করে একটা হাত ধরে ফেলেছে রানার। 'কখন থেকে দরজায় ধাক্কা মারছি...'

মৃদু একটু হাসলো রানা। 'দুঃখিত, জুলি। হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগছিলো...ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' হঠাৎ প্রশ্ন জাগলো মনে, এই মেয়েটাও কি পপকিনের লোক?

'এখন ভালো তো?' হাত ধরে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে জুলি। চোখমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। 'নিচে নামার আর দরকার নেই, রুম সার্ভিসকে বলে ডিনার আনিয়ে নিলেই চলবে। ডাক্তারকে ডাকবো?'

'আরে না,' বিছানায় বসলো রানা। 'আমি ঠিক আছি। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিলো—তেমন কিছু না। এখন ঠিক আছি।'

'দেখি তো,' শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে উল্টো পিঠ দিয়ে রানার শরীরের উত্তাপ অনুভব করলো জুলি। 'গা এমন ভিজে কেন? এতো ঘেমেছো? ইস্, কী ঠাণ্ডা!'

হেসে ফেললো রানা। জুলির হাত ধরে নিজের পাশে বসালো। তুমি খামোকা ভাবছো। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। 'তুমি বসো,' উঠে দাঁড়ালো রানা। 'চট্ করে তৈরি হয়ে নিই আমি। নিচেই ডিনার খাবো আমরা।'

অবাক হয়ে গেলো জুলি। এখনো রেগে আছে লোকটা! এর আগে যে ক'বার এই কামরায় ঢুকেছে সে, ঢোকা মাত্র প্রতিবারই বুভুক্ষু নেকড়ের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফিলাতভ।

'এক্ষুণি তৈরি হতে চাইছো? সবে তো সাতটা। একটু রাত

করেও তো ডিনার খেতে পারি আমরা ?' বললো জুলি।

'তা পারি,' বললো রানা। 'বারে বসে সময়টা কাটাই চলো। ঘরে বসে থেকে লাভ কি ?'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো জুলি। চেহারাটা ম্লান হয়ে গেছে। রানা বাথরুমের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে দেখে ওর একটা হাত ধরে ফেললো সে। দাঁড়ালো। 'না, এক্ষুণি পোশাক পাল্টাবার দরকার নেই। আস্তন,' চোখ বুজলো জুলি। মুখটা হাসি হাসি। 'আস্তন, ডারলিং, আমাকে একটা চুমো খাবে ?'

মাথাটা একটু পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলো জুলিকে রানা। ম্যাজেণ্টা রঙের স্কার্ট, তাতে গোঁজা ফুলহাতা সাদা শার্ট টান টান হয়ে আছে উদ্ধত বুকের কাছে। এক ইঞ্চি সরে এলো রানা। ঠোঁট দু'টো মৃদু ফাঁক হয়ে আছে জুলির। খুঁটিয়ে দেখলো মুখটা। ভাবছে ফিলাতভের অভিনয় করে যেতে হবে ওকে, উপায় নেই। ঝুঁকলো একটু। ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দু'টো দেখলো। একটু ভিজে ভিজে। অধরে অধর রেখে চুমো খেলো রানা। একবার। আলতো-ভাবে। তারপর মুখ তুললো। 'খেলাম। সন্তুষ্ট ?'

চোখ খুললো না জুলি। ছাড়লো না রানাকে। 'না।' আশা করছে, রাগ দূর হয়ে গেছে ফিলাতভের, রোজ যা করে আজও সে তাই করবে, টেনে হিঁচড়ে খুলে নেবে তার পোশাক··· ।

'না ?' ইতস্তত করছে রানা।

'কি হলো, আস্তন ?' চোখ মেললো জুলি। অবাক দেখাচ্ছে তাকে। কেন আমার ওপর রাগ করে আছো তুমি ? প্লিজ, বলেছি তো, মাফ করে দাও···'

'কি বলছো তুমি এসব ?'

'কি হয়েছে তোমার? আমাকে আর ভালো লাগে না?'

'ছিঃ ছিঃ। কেন…'

'তাহলে এমন নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করছো কেন আমার সাথে? তুমি ভালো করেই জানো, তুমি যা বলবে, যা চাইবে তা না করে আমার উপায় নেই। যা চেয়েছো তাই পেয়েছো আমার কাছ থেকে। গতকাল তোমার শরীর খারাপ ছিলো বলেই না আপত্তি করেছিলাম।'

এক টানে শার্টের চেন খুলে ফেললো সে। ব্রার হুক খুলে দিতেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো ভরাট উন্নত দু'টি গোলাপী মাংসপিণ্ড।

ধ্বক করে উঠলো বুকটা রানার। কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করছে। হঠাৎ বেড়ে গেছে শরীরের রক্ত চলাচল। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না ও।

হাসছে জুলি। রানার একটা হাত ধরলো, টানলো বিছানার দিকে। 'কই, এসো।'

মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটলো রানার ঠোঁটে। দু'হাতে চেপে ধরলো জুলির কাঁধ, টেনে আনলো বুকের উপর। মুখ তুলে তাকালো জুলি। আবার নেমে এলো রানার ঠোঁট জোড়া। একটা হাত নেমে গেলো জুলির কোমরে, স্কার্টের চেনের উপরে, টেনে নামিয়ে দিতেই ঝুপ করে মেঝেতে পড়লো স্কার্টটা গোল হয়ে। রানার শার্টের বোতাম খুলছে জুলি। হাত বাড়ালো রানা, আলোর সুইচটা অফ করে দিলো। পাঁজাকোলা করে তুলে নিলো ওকে বুকের কাছে।

অস্থির হয়ে উঠলো জুলি। পাগল করে তুলছে ওকে লোকটা আজ…

অন্ধকার ঘর। ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো ওদের। আর কোনো শব্দ নেই। কোনো নড়াচড়া নেই।

ফিসফিস করে বললো জুলি, 'কে তুমি? আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভ নও। কে তুমি?'

'মানে?' অস্ফুটে জানতে চাইলো রানা।

জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে ওরা। রানার গালের সাথে সেঁটে আছে জুলির মুখ। নিচু গলা, প্রায় শোনা যায় কি যায় না, অথচ উগ্র একটা কৌতূহল, সেইসাথে আতঙ্কের রেশ টের পাচ্ছে রানা জুলির স্বরে, 'আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। হুবহু ফিলাতভের মতো দেখতে, কিন্তু তুমি অন্য কেউ তোমার শরীর একজন শক্তি-শালী যুবকের শরীর। কে তুমি?'

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো জুলির, অনুভব করলো রানা। অভয় দিয়ে জুলির নগ্ন পিঠে একটু হাত বুলালো রানা। অস্ফুটে বললো, 'মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা?' বিস্ময়ে কেঁপে গেলো জুলির চাপা কণ্ঠস্বর। 'কে সে?'

'আমি বাঙালী। বাঙালী ইহুদি। নামটা মনে আছে শুধু। তেলআবিবে ছিলাম।'

'এখানে কেন?'

'জানি না।'

'জানো না?'

'মনে নেই। কিছুই মনে করতে পারছি না,' শান্ত কিন্তু শিশুর মতো অসহায় একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে রানার বলার ভঙ্গিতে। 'হঠাৎ গতকাল ঘুম থেকে উঠে নিজেকে আবিষ্কার করেছি এই হো-

টেলে। অন্য চেহারা নিয়ে। দেখতে আমি অনেক ভালো, চেহারাটা মনে আছে। স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি।' হঠাৎ জুলির নগ্ন পিঠ খামচে ধরলো রানা। 'জুলি! জুলি তুমি সত্যি জানো আমি ফিলাতভ নই? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, আমি হয়তো ফিলাতভই। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে গেছি, তাই নিজেকে বাঙালী ভাবছি, মাসুদ রানা ভাবছি। আসলে হয়তো···সত্যি ধরতে পেরেছো? আমি ফিলাতভ নই?'

অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা রানার গলার সুরে। সংক্রামিত হলো সেটা জুলির মধ্যে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো সে। হাতড়ে টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা খুঁজে নিয়ে আলো জ্বাললো। তিন সেকেণ্ড রানার চোখ দু'টো দেখলো জুলি। রানার নগ্ন শরীরের উপর চোখ বুলালো। হাঁটুর কাছে পুরানো কাটা দাগটার দিকে থমকালো দৃষ্টি, একটু ঝুঁকে পড়লো জুলি। উরু বেয়ে উঠে আসার পথে আবার একবার থমকালো, তারপর সোজা এসে স্থির হলো রানার চোখে। মাথা নাড়লো এদিক ওদিক।

'কে? কে আমি?' আগ্রহের আতিশয্যে ঝট্ করে বিছানার উপর উঠে বসলো রানা। জুলির একটা কাঁধ খামচে ধরলো।

'তুমি ফিলাতভ নও। কিন্তু তুমি যদি ফিলাতভ না হও, এখানে কি করছো?'

'ফিলাতভ হিসেবে অভিনয় করে যেতে বলা হয়েছে আমাকে' বললো রানা। 'দেশের স্বার্থে আপত্তি করিনি।'

'কে বলেছে অভিনয় করে যেতে?'

একটু ভাবলো রানা। 'তুমি চিনবে কিনা জানি না। আমাদের দুতাবাসের কার্ল পপকিন নামে এক লোক।'

'কার্ল পপকিন।' জুলির গলাটা এক পর্দা চড়ে গেলো। বিস্ময়ের সাথে একটু যেন স্বস্তির ভাবও ফুটে উঠলো তার মুখের চেহারায়। 'তিনি জানেন সব?'

'হ্যাঁ,' বললো রানা। 'কিন্তু আমার কথা বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছে না। তোমার কোনো সন্দেহ নেই তো…'

'প্রশ্নই ওঠে না, রানা,' বললো জুলি। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়িয়ে নিচু তেপয় থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলো সে। ডায়াল করলো। 'হ্যানসেন, জুলি। মিঃ কার্ল পপকিনকে

'বলছি জুলি। তোমার ফোনের অপেক্ষাতেই আছি।' গম্ভীর কিন্তু উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কার্ল পপকিনের 'কে ও? ফিলাতভ?'

'না।'

'আর ইউ শিওর?'

'মোর দ্যান শিওর, স্যার।'

'মাই গড!' আর্তনাদ বেরিয়ে এলো পপকিনের গলা থেকে 'ফিলাতভ তাহলে কোথায়?'

ভয়ে ভয়ে রিসিভারটা কানের কাছ থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিলো জুলি। এ ধরনের আর্ত চিৎকার সহ্য করার ক্ষমতা ওর কানের নেই। জবাব দেবার কথা ভাবছে না। প্রশ্নটা নিজেকেই করেছে কার্ল পপকিন।

পাঁচ সেকেণ্ড পর জানতে চাইলো জুলি, 'স্যার, আমার দায়িত্ব কি শেষ হয়ে গেলো…?'

'পাগল হলে নাকি?' দ্রুত বললো পপকিন। 'দায়িত্ব কয়েকশো গুণ বাড়লো আরো। ওকে ছেড়ে নড়ো না। কাছ থেকে লক্ষ্য

রাখো।'

'ইয়েস, স্যার।'

খটাস! অপর প্রান্তে রিসিভার রেখে দেবার শব্দ।

গিটারের হালকা টুংটাং। পরিবেশটা ঠাণ্ডা। অল্প ক'টা জুটি বারে, মৃদু গলায় কথা বলছে, চুমুক দিচ্ছে যার যার গ্লাসে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জুলি। বয়স্ক, প্রৌঢ় এক লোকের মুখ, বেমানান···সে-জায়গায় সুন্দর এক যুবকের মুখ কল্পনা করছে সে, বলিষ্ঠ গড়নের দীর্ঘ দেহী একজন যুবককে মানায়, এমন একটা মুখ।

'কি দেখছো?' ম্লান গলায় জানতে চাইলো রানা।

একটু থতমত খেয়ে সলজ্জভাবে হাসলো জুলি। 'তোমার আসল চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম।'

বুকটা গুমরে উঠলো রানার। গলা বেয়ে উঠে আসতে চাইছে একটা ক্ষোভের বুদ্বুদ। জানা ছিলো না, নিজের চেহারাটা ওর কাছে এতো প্রিয়। সেটা হারিয়ে বুঝতে পারছে কতো ভালবাসতো ও নিজের মুখটাকে।

ওর মনের কথা কিভাবে যেন টের পেয়ে গেছে জুলি। টেবিলের উপর পড়ে থাকা রানার হাতটা চেপে ধরলো ও। দু'জন চেয়ে আছে দু'জনের চোখে। 'দুশ্চিন্তা করো না, রানা,' আশ্বাস দিতে গিয়ে কেঁপে গেলো জুলির গলা। 'যাই ঘটে থাকুক, সব প্রশ্নের উত্তর আমরা পাবোই। আবার সব মনে পড়বে তোমার। আবার তুমি ফিরে পাবে তোমার আসল চেহারা।'

সত্যি? সত্যি ফিরে পাবো আমার চেহারা? সব আবার মনে পড়বে? ভাবছে রানা। তেলআবিবে নিশ্চয়ই ওর আত্মীয়-স্বজন

আছে, আছে ভাই-বোন, মা-বাবা···আচ্ছা, ও কি বিয়ে করেছে? যদি করে থাকে, কেমন দেখতে ওর বউ? ছেলেমেয়ে ক'টা? সব মনে পড়বে? আবার তাদের সাথে দেখা হবে? তাদেরকে চিনতে পারবে ও? 'তুমি বলছো, জুলি? সত্যি···?' কথা শেষ করতে পারলো না রানা, আবেগে বুজে এলো কণ্ঠস্বর।

'নিশ্চয়ই। স্মৃতি ফিরে পাওয়া আজকাল আর তেমন অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়। স্মৃতিভ্রংশের চিকিৎসা করলেই আবার সব মনে পড়বে তোমার। আর চেহারার ব্যাপারটা তো কোনো সমস্যাই নয়। প্লাস্টিক সার্জারী···'

'জুনেস্কি বলেছে আগামীকাল ডাক্তাররা পরীক্ষা করবে আমাকে,' বললো রানা। 'দেখা যাক ওরা কি বলে।'

'সবচেয়ে ভালো হবে, এবং সবচেয়ে খুশি হবো আমি, রানা, তুমি যদি এসব সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে হাসিখুশি থাকো,' অদ্ভুত একটা মমতার সুর জুলির কণ্ঠে।

'টেলিফোনে তখন কি বললো পপকিন?' জানতে চাইলো রানা। 'ফিলাতভ গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলো। কিন্তু আমার তো কোনো গুরুত্বই নেই। তোমার বস তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার কথা ভাবছেন?'

হাসছে জুলি। 'আরে না। দায়িত্ব আরো বেড়েছে আমার। সারাক্ষণ তোমার কাছে থাকতে হবে এখন থেকে আমাকে।'

'যার নিজের মুখ নেই, অতীত ভুলে গেছে, ঠিকানা নেই, তাকে সঙ্গ দেয়া—খুব কঠিন এবং নিরস কাজের দায়িত্ব চেপেছে তোমার ঘাড়ে। দুঃখিত, জুলি। দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া···'

'কঠিন? নিরস?' খিলখিল করে হাসলো জুলি। ফোটা ফুলের

মতো জুলির হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে রানা। জুলি হাসি থামিয়ে বললো, 'বাড়িয়ে বলছি না, তোমার কাছে থাকার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করছি, রানা। কোথাও লোকসান নেই, সবটুকুই আমার লাভ।'

'লাভ? কিসের লাভ?'

দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে মাথা নাড়লো জুলি, সুরের ঝঙ্কারের মতো লাগলো তার কথাগুলো রানার কানে, 'সে কথা বলতে মানা। কোনো মেয়ে তা উচ্চারণ করতে পারে না।'

বুঝে নিলো রানা। মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আমিও ভাগ্যবান। লাভের পরিমাণ তোমার চেয়ে আমারও কম নয়।'

'চলো পালাই,' হঠাৎ ফিসফিস করে বললো জুলি। চোখেমুখে পরিষ্কার একটা ষড়যন্ত্রের ভাব ফুটে উঠলো তার।

'কি? পালাবো?'

'হ্যাঁ,' রানার দিকে ঝুঁকে পড়লো জুলি। 'জ্যাক জাস্টিস আর তার বউ আসছে ...ওহ্ হো, ওদেরকে তো তুমি চেনোই না...'

'কারা ওরা?'

'দুনিয়ার সেরা বোর ওই লোক। আর বউটা দুনিয়ার সেরা পেত্নী। ওই যে ঢুকছে...'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানা। দেখলো বারের দরজা জুড়ে বিশাল পাহাড়ের মতো এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। দু'পাটি দাঁত বেরিয়ে আছে তার, রানার উদ্দেশ্যেই হাসছে। চিকণ, মেয়েলী গলায় বললো, 'এই পেয়েছি। ফিলাতভ, মাই ফ্রেণ্ড, কালকের সেই গল্পটা শোনাবার জন্যে শ্রোতা পাচ্ছিলাম না...তুমি আমাকে বাঁচালে, ভায়া।' এগিয়ে আসছে সে। তার পিছনে কদাকার চেহারার এক নিগ্রো

মেয়ে, ছুঁচোর মতো মুখ, আশ্চর্য বেঢপ গড়ন তার শরীরের। দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করলো না।

রানার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে ওকে জুলি। 'রাতটাই মাটি করবে, চলো পালাই,' দরজার দিকে এগোলো ওরা। মুখোমুখি পড়ে গেলো জ্যাক জাস্টিস আর তার স্ত্রীর।

'দুঃখিত, জ্যাক,' বললো রানা। 'বিশেষ একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে···'

'প্লিজ, জ্যাক জাস্টিসের মেয়েলি গলা থেকে হাহাকার ধ্বনি বেরিয়ে এলো। 'এমন নিষ্ঠুর আচরণ আমার সাথে করো না। ফর গডস সেক, গল্পটা বলতে না পারলে,' বুড়ো আঙ্গুল বাঁকা করে নিজের প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে টোকা মারলো। 'এটা বুম করে ফেটে যাবে·

খনখনে গলায়, বিলাপের সুরে লিজা বললো 'তাহলে আমার কি·হবে গো··· প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

সহানুভূতিতে ম্লান হয়ে গেলো জুলির মুখ। 'দুঃখ করো না, বোন,' লিজার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো সে একপাশে, রানার হাতটাও ধরে আছে শক্ত করে। দু'পা এগিয়েই লিজার হাত ছেড়ে দিয়ে রানাকে নিয়ে দরজার দিকে দ্রুত এগোলো সে।

'আরে, চলে যাচ্ছে ···'

ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে দরজা দিয়ে ওরা। ধাওয়া করতে যাবে জ্যাক জাস্টিস, এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়ালো জুনেস্কি। এই যে, 'ওস্তাদোঁকো ওস্তাদ, কি খবর? আরে, আরে, লিজা যে? কেমন আছো তোমরা?'

'ভালো,' মুখটা হাঁড়ি করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলো জ্যাক জাস্টিস। 'পথ ছাড়ো।'

'সে কি। তোমাদেরকে একটা গল্প বলবো বলে খুঁজছি যে…'

গজর গজর করছে জ্যাক জাস্টিস। 'আমাদের গল্পই কে শোনে, উনি এসেছেন·· যত্তোসব!' জ্নেস্কিকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেলো জ্যাক জাস্টিস লিজাকে নিয়ে।

নয়

পরদিনটা জুলির সাথে চমৎকার সময় কাটলো রানার। হোটেল কামরা ছেড়ে বেরোলো না। গুণী মেয়ে, নানান কৌশলে মাতিয়ে রাখলো রানাকে। আধ বেলা ধরে রানার ছবি আঁকলো সে কাগজের বুকে পেন্সিলের আঁচড় কেটে। রানা কাছ থেকে অবশ্য নির্দেশ-পরামর্শ না দিলে কাজটায় সফল হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না তার। শেষ পর্যন্ত রানার আসল চেহারার খানিকটা আভাস ফুটে উঠলো কাগজের বুকে।

'মাই গড।' নিজের শিল্পকর্মের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকলো সে। 'তুমি এতো সুন্দর?' তাকালো ঘাড় ফিরিয়ে। 'রানা?'

দৈনিক পত্রিকা থেকে মুখ তুললো রানা। 'বলো।'

এগিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়ালো জুলি। ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমু খেলো আলতো ভাবে। 'আই লাভ ইউ।'

দেয়াল থেকে সাক্ষী দিলো টিক টিক টিক করে একটা টিকটিকি। এব যোগে হেসে উঠলো ওরা।

এ মেয়েকে ভালো না লেগে উপায় নেই, ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছে রানা। কোনো ক্লান্তি নেই, অভিযোগ নেই, সারাক্ষণ ওকে নিয়ে ব্যস্ত। ওর সুবিধে-অসুবিধের দিকে তীক্ষ্ণ নজর। কোন্ মিউজিক পছন্দ রানার? টিভি দেখবে কিনা? ক্ষিদে পেয়েছে? ড্রিঙ্ক? কফি? বইটই পড়তে চায়? কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে? একা থাকলে ভালো লাগবে? এইরকম হাজারটা প্রশ্ন। নিজে ভালো গিটার বাজাতে পারে। আধাঘণ্টা বাজিয়ে শোনালো। তারপর লাঞ্চ। জ্যাক জাস্টিস নাকি তার বিরাট এক বন্ধু-বান্ধবের দল নিয়ে ওত্ পেতে আছে,নিচে থেকে ঘুরে এসে বললো জুলি। রুম সার্ভিসকে ডেকে লাঞ্চ আনিয়ে নিলো ওরা।

তারপর জোর করে শুইয়ে দিলো বিছানায় রানাকে, নিজের কোলে তুলে নিলো মাথাটা। 'এখন তোমার সবচেয়ে বেশি দরকার এই জিনিসটা—ঘুম।' রানার চুলে বিলি কাটছে। 'অ্যাই পাজি শয়তান, ফের চোখ পিট পিট করে। চোখ বোজো বলছি।'

বিকট একটা দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো রানা। ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানার উপর। দেখলো জুলির কোলে মাথা রেখেই ঘুমিয়েছিলো এতক্ষণ ও। শুয়ে আছে জুলি, কখন যেন সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথায় বালিশ নেই।

ঘামে ভিজে গেছে রানার শরীর, হাঁপাচ্ছে। ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। ব্যাপারটা কি? এমন কেন হচ্ছে?

বাথরুম থেকে ফিরে এসে বিছানায় বসলো রানা। আলতো ভাবে জুলির মাথাটা ধরে বালিশে তুলে দিতে যাবে, ঘুম ভেঙে

গেলো জুলির। লজ্জা পেয়ে হাসলো একটু, 'ছিঃ ছিঃ—নিজেই কেমন ঘুমিয়ে পড়েছি…কখন ঘুম ভাঙলো তোমার? কেমন লাগছে শরীরটা?'

'ভালো লাগছে,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা, 'কিন্তু …'

'কি ব্যাপার, রানা?' উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে জুলিকে।

'একটা দুঃস্বপ্ন…'

'আবার?'

'হ্যাঁ। ভীষণ ভয় পেয়েছি। কারা যেন ভয় দেখায়। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর কিছুই মনে করতে পারি না।' অসহায় ভাবে বললো রানা। 'বুঝতে পারছি না কেন এমন হচ্ছে।'

রানার একটা হাত কোলের উপর তুলে নিলো জুলি। 'ভয়ের কিছু নেই রানা। আমার মনে হয় তোমার স্মৃতি হারাবার সাথে এই দুঃস্বপ্নগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ ডাক্তাররা দেখবেন তোমাকে, ওঁরা বলতে পারবেন কি থেকে কি হয়েছে, কদ্দিন লাগবে…'

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত পপকিন বা জুনেস্কির কোনো ফোন এলো না। হোটেলের পেছনের গেট দিয়ে বাইরে বেরুলো ওরা। ফুটপাত ধরে অনেকক্ষণ হাত ধরাধরি করে হাঁটলো। হাসির অনেক গল্প বলছে জুলি। সব ভুলে হাসতে চাইছে রানা, কিন্তু পারছে না। থেকে থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। অসংখ্য প্রশ্ন আড়ষ্ট করে তুলছে ওকে। কে ও? কি ওর পরিচয়? ঠিকানা কি? কোথায় ওর দেশ? কার ছেলে? কার স্বামী? কার বাবা? এখানে কেন ও? কে বদলে দিয়েছে ওর চেহারা? কিভাবে স্মৃতি হারালো? ওকে নিয়ে বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে, কারা ওরা? তাদের উদ্দেশ্য কি? শেষ পর্যন্ত কি হবে? এর শেষ কোথায়? বদ্ধ পাগল হয়ে যাবে ও?

দুঃস্বপ্নগুলো কি তারই লক্ষণ ? যারা ওর চেহারা বদল করেছে তাদের উদ্দেশ্য কি তাই ? ও কি সাংঘাতিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলো, শত্রুতা বশতঃ এই ক্ষতি করা হয়েছে ওর, যাতে ও পাগল হয়ে যায় ? ফিলাতভ···কে সে ? তার কথা উঠলেই জুলি অমন গম্ভীর হয়ে ওঠে কেন ? কেন এড়িয়ে যায় ? লোকটা গেলই বা কোথায় ? আচ্ছা, সে-ও কি ওর মতো একই সমস্যায় পড়েছে ? হঠাৎ মাসুদ রানা হয়ে গেছে ? নিজেকে চিনতে পারছে না ? চিনতে না পারলে, তাতে খুশি হবারই কথা তার। বুড়ো একটা মুখের বিনিময়ে নিখরচায় সুদর্শন একটা মুখ পেয়ে গেছে।

বাইরে বেরুলেই একদল লোক অনুসরণ করছে ওকে. দৃষ্টি এড়ায়নি রানার। অনেকগুলো লোক, কিন্তু তারা সবাই একই দলভুক্ত কিনা জানে না রানা।

শহরের নির্জন একটা এলাকার নিরিবিলি একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার খেলো ওরা। বাইরে ঘুর ঘুর করছে লোকগুলো। দরজার কাছে দশাসই চেহারার দু'জনকে দেখতে পেয়েছে রানা। জুলির সাথে চোখ-ইশারায় ইঙ্গিত বিনিময় হতেও লক্ষ্য করেছে। দূতাবাসের লোক ওরা, বুঝে নিয়েছে ও।

ন'টার মধ্যে ফিরে এলো আবার হোটেলে।

'তোমার হাত খুব মিষ্টি,' গিটারটার দিকে চোখ রেখে বললো রানা। 'একটু বাজাবে ?'

'সেই সাথে অনুমতি দাও, একটু নাচি ?' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে গেলো জুলি। লাল প্যান্ট, কোমরে গোঁজা ফুল হাতা সাদা শার্টে সত্যিই মানায় ওকে। গিটার তুলে নিলো, টুংটাং ঝঙ্কারের সাথে ছন্দ মিলিয়ে আলতো ভাবে পা ফেলছে, সুরের তালে

তালে নাচছে জুলি। মৃদু হাসি রানার ঠোঁটে। বাঁ হাতে পাইপ, ধোঁয়া উঠছে এঁকে বেঁকে।

ঠিক পৌনে দশটায় নক হলো দরজায়। একবার, তিন সেকেণ্ডের বিরতি, তারপর পর পর দু'বার। জুনেস্কি এসেছে, বুঝলো জুলি। তবু প্রশ্ন করে সাড়া নিলো, তারপর দরজা খুললো সে। ফিসফিস করে কিছু জিজ্ঞেস করলো জুনেস্কি জুলিকে। কাঁধ ঝাঁকালো জুলি। চেয়ারে বসে কামরার মাঝখান থেকে দেখছে রানা।

দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এলো জুনেস্কি। রানার সামনে দাঁড়ালো। 'ডাক্তার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনি তৈরি?'

'এই অসময়ে?'

শ্রাগ করলো জুনেস্কি। অবান্তর প্রশ্ন। নিতে এসেছি, তৈরি হয়ে নিয়ে চলুন।'

অবাক হয়ে তাকালো রানা। একটু রূঢ় লাগছে জুনেস্কির আচরণ। লক্ষ্য করলো, ব্যাপারটা পছন্দ করছে না জুলিও। কিছু বলতে যাচ্ছিলো জুনেস্কিকে সে, কিন্তু কি ভেবে সামলে নিলো নিজেকে।

এসব দিকে লক্ষ্য নেই জুনেস্কির। স্যুটকেসের উপর ভাঁজ করে রাখা পাজামাটা দেখে ভুরু কুঁচকে উঠেছে তার। 'ওগুলো পরেন না?'

'ফিলাতভ পরতো,' বিছানার কিনারায় বসে পায়ে মোজা গলাচ্ছে রানা। 'আমি পরি না।'

'ও,' আরো গম্ভীর হলো জুনেস্কি।

জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো জুলি। সেটা গায়ে চড়াচ্ছে রানা। জুলি, তুমিও যাচ্ছো, 'তাই না?'

'আমি···মানে···'

'না। জুলি যাচ্ছে না। ওর কাজ আছে এখানে।' জুনেস্কির গলার স্বর বেশ কঠিন।

তার দিকে ফিরলো রানা। 'ফিরে যাও তাহলে। পপকিনকে গিয়ে বলো, আমি যাবো না।'

'যাবেন না?' অবাক হয়ে গেছে জুনেস্কি। 'কেন?'

'জুলিকে না নিয়ে কোথাও আমি যাবো না।'

'রানা, লক্ষ্মী, শোনো…' জুলি এগিয়ে আসছে।

বসেই থাকলো রানা। নিভে যাওয়া পাইপটা তেপয় থেকে তুলে নিলো। 'লোকটা চলে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দিও, জুলি।'

অসহায় ভাবে জুনেস্কির দিকে তাকালো জুলি।

'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বিরক্তভাবে কাঁধ ঝাঁকলো জুনেস্কি। 'তবে তুমিও চলো, জুলি, কিন্তু বস…'

'বুঝিয়ে বলব'খন আমি,' দ্রুত বললো জুলি।

নিচে নেমে এসে জুনেস্কির গাড়িতে চড়লো ওরা। ব্যাক সীটে জুলির সাথে বসেছে রানা। রাস্তায় বেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিতেই বুঝলো রানা, জুনেস্কি ওকে দূতাবাসে নিয়ে যাচ্ছে না। জানতে চাইলে বললো, 'শান্ত হয়ে বসে থাকুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবো আমরা।'

দু'মিনিটের মধ্যেই পথের দিশা হারালো রানা। এদিক ওদিক যথেচ্ছ মোড় নিয়েছে গাড়ি, দিকভ্রান্ত অবস্থা হয়েছে রানার। একটু অস্বস্তি বোধ করছে। তা টের পেয়ে ওর একটা হাত ধরে কোলের উপর তুলে নিয়ে মৃদু আশ্বাসসূচক চাপ দিলো জুলি। জুনেস্কির উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে পারেনি রানা। হয়তো ওকেই দিশাহারা করতে চাইছে। নয়তো সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের খসাতে চাইছে।

কয়েক মিনিট পর একটা বড় বিল্ডিংয়ের সামনে থামলো গাড়ি। দশটা ফ্ল্যাট নিয়ে পাঁচ তালা দালান। এলিভেটরে চড়ে টপ ফ্লোরে উঠলো ওরা। একটা দরজার তালা খুলে ইঙ্গিতে ভিতরে ঢুকতে বললো জুনেস্কি।

হলরুমে ঢুকে ছ'দিকে ছ'টো দরজা দেখলো রানা। একটা দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো জুনেস্কি, রানাকে ভিতরে ঢোকার ইঙ্গিত করে বললো, 'সার্জেন মিঃ হেলমুট রেচার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—ভিতরে যান। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।'

একটু ইতস্তত করলো রানা। জুলিকে কাছ ছাড়া করবে কিনা ভাবছে।

দরকার হলেই আমাকে ডেকো, রানা, রানার হাত ধরে বললো জুলি। কথা দিচ্ছি, তোমাকে একা রেখে এখান থেকে এক মিনিটের জন্যেও কোথাও যাবো না আমি।'

হাসলো রানা। বিশ্বাস করেছে জুলির কথা।

রেচার মধ্য বয়স্ক। মেদ জমতে শুরু করেছে শরীরে। ক্লিনশেভ, মাথা জোড়া মস্ত একটা টাক। গলার আওয়াজটা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। 'আসুন, মিঃ রানা। আপনার সেবা করার সুযোগ দিন আমাকে।'

পেছনে শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালো রানা। জুনেস্কি বেরিয়ে গেছে কামরা থেকে। দরজাটা বাইরে থেকে আটকে দিয়েছে সে।

রেচারকে দেখলো আবার রানা। তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে উঁচু টেবিলটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। নিঃশব্দে খুললো জ্যাকেট আর শার্ট। টেবিলে উঠে শুয়ে পড়লো লম্বা হয়ে।

ছোট্র একটা কাঁচি দিয়ে ব্যাণ্ডেজটা খুলে পাঁজরের আঘাতটা

পরীক্ষা করলো রেচার। 'জঘন্য,' বললো সে। 'কিন্তু পরিষ্কার। 'একটা লোকাল অ্যানেসথেটিকের দরকার হবে। 'আপনার অ্যালার্জী আছে, মিঃ রানা?'

'জানি না– নেই বলে মনে হয়।'

'তিনটে পিঁপড়ের কামড় অনুভব করবেন শুধু– তার বেশি কিছু না,' হাইপডারমিক সিরিঞ্জ বের করে সেটা একটা ফাইল থেকে ভরে নিলো রেচার। 'শুয়ে থাকুন। নড়বেন না।

কামড়গুলো অনুভব করলো রানা।

'ওষুধের ক্রিয়া শুরু হতে একটু সময় নেবে, আপনি এখন উঠে বসতে পারেন,' ব্যাগ থেকে একটা অপথ্যালমোস্কোপ বের করলো ডাক্তার। 'আপনার চোখ ত্ু'টো একটু দেখবো।' রানার ডান চোখের উপর টর্চের আলো ফেললো সে। 'দু'চার ঘণ্টার মধ্যে মদ টদ খেয়েছেন নাকি?'

'না।'

টর্চের আলো এবার রানার বাঁ চোখে ফেললো রেচার। অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। 'মনে হচ্ছে ঠিকই আছে।'

ছোরার আঘাতটা আমি বুকের পাশে খেয়েছি, মাথায় নয়,' বললো রানা। 'মাথায় চোট খেয়ে মগজের কোনো ক্ষতি বা কংকাশন হয়েছে, তাই স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি, তাও নয় ব্যাপারটা।'

'ডাক্তারী বিদ্যা অল্প-স্বল্প জানা আছে দেখছি,' অপথ্যালমোস্কোপটা সরিয়ে নিলো রেচার। 'কিন্তু অল্প বিদ্যা...জানেনই তো।' উঠে দাঁড়ালো সে, রানার মাথাটা পরীক্ষা করছে হাত দিয়ে। 'খুলিতে কখনো কিছু হয়েছিলো? খুশকি? অথবা...'

'না। যদি হয়েও থাকে, মনে নেই।'

'আই সি। ঠিক আছে।' রানার পাঁজরগুলোয় আঙুলের চাপ দিলো রেচার। 'কিছু অনুভব করছেন।'

'অসাড়। তবে চাপটা অনুভব করছি।'

'গুড। ক্ষতটা সেলাই করে দিচ্ছি। কিছুই টের পাবেন না। যদি পান, চেঁচাবেন।' সীল করা প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে একজোড়া গ্লাভস বের করে হাতে পরে নিলো রেচার। আরেকটা প্যাকেট থেকে মিহি সুতো বের করলো। 'শুয়ে পড়ুন। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকুন।'

সেলাইয়ের কাজটা নিখুঁতভাবে শেষ করতে পনেরো মিনিট সময় নিলো রেচার। তার আঙুলের চাপ ছাড়া কিছুই অনুভব করলো না রানা।

'হয়ে গেছে মিঃ রানা।'

উঠে বসে ক্ষতটা দেখলো রানা। জোড়া লেগে গেছে ক্ষতটা।

'সুতো খুলে নেবার পর শুধু চুলের মতো লম্বা একটা দাগ থাকবে। এক বছর পর সেটাও আর দেখতে পাবেন না।' ব্যাগ গুছিয়ে নিলো রেচার। 'এখুনি আরেকজন ডাক্তার আপনাকে দেখতে আসছেন,' বলে ঘুরে দাঁড়ালো সে। দ্রুত বেরিয়ে গেলো দরজা খুলে। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলো সে।

একটু খটকা লাগলো রানার। টেবিল থেকে নেমে এগিয়ে গেলো। মৃদু ধাক্কা দিয়ে বুঝলো, যা ভেবেছে তাই, বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া হয়েছে দরজায়। ভুরু কুঁচকে কামরার চারদিকে চোখ বুলালো ও। টেবিলটা ছাড়া দু'টো আর্মচেয়ার, ছোট আরো একটা টেবিল, দেয়ালের সাথে একটা বুক কেস, ফার্নিচার বলতে এই। বুক কেসটার দিকে এগোলো ও। কিসের সাথে পা আটকে গেলো ওর। একই সময় কি যেন নড়ে উঠলো নিচু টেবিলের উপর।

টেলিফোনের তারের সাথে পা বেধে গেছে ওর। আর একটু হলে টেবিল থেকে পড়ে যেতো যন্ত্রটা। সেটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রানা।

করিডোর ধরে এগিয়ে গিয়ে শেষ মাথার দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো হেলমুট রেচার। পপকিন এবং জুনেস্কি কথা থামিয়ে ঝট্ করে তাকালো তার দিকে। ডান কোগিন, সাইকিয়াট্রিস্ট, বসে আছে একটা আরাম কেদারায়, পা দু'টো সামনে প্রসারিত, হাত দু'টো কোলের উপর, দশটা আঙ্গুলের মাথা পরস্পরের সাথে লেগে আছে। কামরায় আরো একজন লোক রয়েছে, তাকে চেনে না রেচার। পপকিন বললো, 'উইলিয়াম স্টকটন, আমার স্টাফ। ওয়েল?' ব্যাগ্রতা চেপে রাখতে পারছে না সে।

ব্যাগটা নামিয়ে রাখলো রেচার টেবিলে। 'ও ফিলাতভ নয়,' একটু থামলো। 'তবে, ইদানীং যদি ফিলাতভ প্লাস্টিক সার্জারী করে থাকে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা ধীরে ধীরে ছাড়লো পপকিন। 'আপনি শিওর?'

হাসলো রেচার। উত্তরটা একটু রসিয়ে দিলো, 'যা দিবালোকের মতো সত্য তাই বললাম। ও ফিলাতভ নয়।'

'হুঁ,' ডান কোগিনের দিকে তাকালো পপকিন, 'এবার আপনার পালা, ডাক্তার কোগিন। ওর ভিতর থেকে যতোটা পারেন খবর বের করে নিন।'

জবাব দিলো না কোগিন। পা দু'টো টেনে নিলো। মুখটা গম্ভীর। উঠে দাঁড়ালো সে। কামরা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

দরজা বন্ধ হতেই টেবিল থেকে একটা কার্ডবোর্ডের ফাইল তুলে নিয়ে খুললো পপকিন। তাকালো রেচারের দিকে। 'তেলআবিব থেকে আমার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এইমাত্র রানার একটা ফটো পাঠিয়েছে।' পপকিনের প্রতিনিধি রানার শুধু ছবিই পাঠাতে পেরেছে, ওর সম্পর্কে আর কোনো তথ্যই সে যোগাড় করতে পারেনি। ফাইল থেকে ফটোটো বের করে রেচারের দিকে বাড়িয়ে ধরলো সে। 'রানার ইদানীংকার তোলা ছবি, জাফার যে ফ্ল্যাটে বসবাস করছিলো', সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। চেহারাটা কি রকম দেখুন। এই চেহারাকে কিভাবে যে এতোটা বদলানো সম্ভব, কিছুতেই বুঝতে পারছি না!'

ফটোগ্রাফটা দেখছে রেচার। 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করলো সে।

'আজ থেকে মাত্র দশ দিন আগেও তেলআবিবের ওই ফ্ল্যাটে দেখা গেছে মসুদ রানাকে,' বললো পপকিন। 'আমাদের হিসাব যদি ভুল না হয়, পরশুদিন ওকে রোপণ করা হয়েছে এখানকার কন্টি-নেন্টাল হোটেলে। তার মানে মাত্র সাত দিনে সারা হয়েছে চেহারা বদলবার কাজটা। সম্ভব?'

ফটোগ্রাফটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো রেচার। 'যতটুকু বুঝতে পেরেছি, স্রেফ এক জায়গায়, বাঁ চোখের পাতার বাইরে কোথাও একটু কাটাকুটি করা হয়েছে। বড়জোর একটা সেলাই পড়েছে, তার বেশি নয়। ওটা শুকাতে এক হপ্তার বেশি লাগার কথা নয়।'

অবিশ্বাস ভরা গলায় জুনেস্কি বললো, ব্যস? আর কোথাও কাটাকুটি করা হয়নি?'

'হয়নি,' বললো রেচার। 'বাঁ চোখের পাতা নিচে নামানোর জন্যে

ছুরি চালানো হয়েছে। ফিলাতভের কোনো ছবি আছে?'

'এই যে,' বললো পপকিন। টেবিলের উপর রানার ছবির পাশে ফিলাতভের ছবিটা রাখলো সে।

তর্জনী দিয়ে দেখালো রেচার। 'ওই—দেখছেন? ওর মুখের ওই যে লম্বা ক্ষত, ওটার জন্যেই ঝুলে আছে বাঁ চোখের পাতা। তাই রানার মুখে শুধু কাটা দাগ সৃষ্টি করে ওকে ফিলাতভে রূপান্তর করা যায়নি, সেই সাথে চোখের পাতাটাকেও নামানো হয়েছে।

'ফিলাতভের মুখে ওই লম্বা দাগটা যুদ্ধের একটা চিহ্ন, সে তখন একেবারে বাচ্চা ছিলো, চুরুট ধরাতে গিয়ে পপকিন লক্ষ্য করছে তার হাত দু'টো একটু একটু কাঁপছে। 'কিন্তু রানার মুখে ওই দাগটা তারা আনলো কিভাবে, কাটাকুটি না করে?'

'খুব চতুরতার সাথে করা হয়েছে কাজটা,' উৎসাহের সাথে বললো রেচার। 'ট্যাটুর এমন নিপুণ কাজ আমি আর দেখিনি। বাঁ চোয়ালের উপর জন্মদাগটাও ওই জিনিস। চেয়ারে হেলান দিলো সে। 'উল্কির কাজ আমিও করি, কিন্তু আমি তুলে নিতে বিশেষজ্ঞ, আরোপে নই।' আবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে, ছবির দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে একটা রেখা খুঁজে বের করলো। 'চুলের রেখা অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে depilation-এর সাহায্যে, কামিয়ে নয়। আশঙ্কা করছি, রানা তার চুলের সৌন্দর্য জন্মের মতো হারিয়েছে।'

'এসব না হয় না বুঝেও হজম করা গেলো,' বললো জুনেস্কি, এগিয়ে এসে টেবিলের উপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে পড়লো সে ফটো দু'টোর দিকে। কিন্তু, লোক দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। রানার মুখে চর্বি নেই। ফিলাতভের চোয়াল ফুলে আছে মেদ জমে। নাক দু'টোয় কতো পার্থক্য লক্ষ্য করুন।

'এর উত্তর আরো সহজ,' বললো রেচার। 'লিকুইড সিলিকোন ইঞ্জেকশনের সাহায্যে আকারে বড় করা হয়েছে রানার মুখ—যেখানে যতোটা দরকার ফোলানো ফাঁপানো হয়েছে। রানার গালে হাত দিয়ে দেখেছি আমি অনুভব করা যায়।' হঠাৎ পপকিনের দিকে তাকালো সে। 'আপনি বলেছেন রানা পুরো একটা হপ্তা স্মরণ করতে পারছে না?'

'শেষ যে কথাটা মনে আছে তার পর থেকে একটা হপ্তা হারিয়ে ফেলেছে, এই রকম কিছু একটা বলতে চায় ও।'

'সেক্ষেত্রে কিভাবে কি হয়েছে তা, আমি মোটামুটি অনুমান করে বলতে পারি,' দ্রুত সিগারেট ধরালো রেচার। 'ড্রাগের সাহায্যে পুরো হপ্তাটা অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিলো ওকে। ওর বাঁ হাতে একটা ড্রেসিং লক্ষ্য করেছি আমি। পরীক্ষা করিনি, তবে কোনো সন্দেহ নেই, ওই জায়গা দিয়েই ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশনের সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় গ্লুকোজ ঢোকানো হয়েছে ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।'

থামলো রেচার। ঘোরের মধ্যে থেকে অস্ফুটে বললো পপকিন, 'বলে যান।'

'চোখের কোণে কাটা হয়েছে, সেটা শুকোবার জন্যে নেয়া হয়েছে

পুরো একটা হপ্তা। যে কোনো উপযুক্ত সার্জেনের পাঁচ মিনিটের কাজ এটা। এরপর, আমার বিশ্বাস, ট্যাটুয়িং করা হয়েছে ওই লম্বা ক্ষত চিহ্নটা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। একটু ব্যথা ভাব প্রথম দিকে থাকার কথা, কিন্তু এক হপ্তা পর তা না থাকাই স্বাভাবিক। বাকি সব হালকা এবং সহজ কাজ।'

ফটোগ্রাফ দু'টো তুলে নিলো সে। 'একটু মনোযোগ দিয়ে দেখ-

লেই বুঝবেন, দু'জন লোকের বোন স্ট্রাকচার, মাথার খুলির আকার সহ, প্রায় একই রকম।' ফটো দু'টো রেখে উঠে দাঁড়ালো রেচার। 'আজ রাতের মতো এর বেশি কিছু করার নেই আমার, জেন্টলমেন। আবার কাল একবার দেখবো আমি রানাকে, ওর নিজের চেহারা ওকে আবার ফিরিয়ে দেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে। কাজটা সম্ভব কিনা বুঝতে পারছি না। ওই সিলিকোন পলিমার বের করা খুবই পাজি কাজ। আর কিছু?'

'না, ডাঃ রেচার। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার কামরা কোথায় তা তো জানেনই, যান, দয়া করে বিশ্রাম নিন এবার।'

বেরিয়ে গেলো রেচার।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো পপকিন এবং জুনেস্কি পরস্পরের দিকে। পপকিন নড়লো, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পেছন দিকে। 'কি বুঝলে, স্টকটন?'

'বুঝিনি, স্যার,' বললো উইলিয়াম স্টকটন। 'ঘোড়ার ডিম কিছুই আমি বুঝিনি।'

'দেখা যাক ডাঃ কোগিন কি বলেন,' বললো পপকিন। 'আজকের রাতটা বেজায় লম্বা লাগছে, স্টকটন। কফির ব্যবস্থা করলে হতো না?'

অস্থির ভাবে পায়চারি করছে পপকিন। সে বসছে না, তাই, বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে, জুনেস্কি এবং স্টকটনও দাঁড়িয়ে আছে একধারে। ঝাড়া দু'ঘন্টা পর ফিরলো কোগিন। 'রানাকে একা থাকতে দেয়া উচিত নয়,' ঢুকেই বললো সে।

'স্টকটন!' দ্রুত বললো পপকিন।

সাথে সাথে দরজার দিকে এগোলো স্টকটন। কোগিন বললো, 'বলতে চাইলে কথা বলতে বাধা দেবেন না। কোনো প্রশ্ন করে বিড়ম্বনায় ফেলবেন না। সাধারণ প্রসঙ্গে কথা বলবেন। বুঝেছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো স্টকটন। চেয়ারে বসলো কোগিন। খুঁটিয়ে দেখছে তাকে পপকিন। কিছু সময় নিঃশব্দে কেটে গেলো। নিজেকে শান্ত রেখে মুখ খুললো পপকিন, 'হুইস্কি, ডক্টর?'

উপর নিচে মাথা ঝাঁকালো কোগিন। 'ধন্যবাদ।' আঙুল দিয়ে কপাল ঘষছে। 'লোকটার অবস্থা বড় খারাপ।'

একটা গ্লাসে দু'আউন্স 'হুইস্কি ঢাললো পপকিন। 'কি রকম?'

'অন্যায় করা হয়েছে ওর ওপর,' কঠিন সুরে বললো কোগিন। 'ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে ওর মনটাকে।'

ওর হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিলো পপকিন। 'মানে? ওর ব্রেন…?'

ছোট্ট একটা চুমুক, তারপর ঢক ঢক করে সবটা হুইস্কি গিলে ফেললো কোগিন। 'হ্যাঁ। অন্যায়টা যারাই করে থাকুক, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে তারা। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে ওর মনের আয়নাটাকে।'

ভুরু কুঁচকে বললো পপকিন, 'রেচার বলেছিলো পুরো একটা হপ্তা অজ্ঞান ছিলো রানা।'

'অনেকটা তাই,' বললো কোগিন। 'ড্রাগের সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিলো ওকে—কিন্তু এই ঘুম ঠিক অচৈতন্য অবস্থা নয়, হালকা তন্দ্রার ঘোরে ছিলো ও।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ওর ব্রেন ওয়াশ…'

'হ্যাঁ। ঠিক তাই। বলতে চাইছি। ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে

মাসুদ রানার। ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছে ওর ওপর কোনো নিষ্ঠুর সাইকিয়াটিস্ট, নির্মমভাবে, অতি অল্প সময়ে।'

'কি অত্যাচার?'

'তাদের উদ্দেশ্য ছিলো লোকটার ব্রেন ওয়াশ করে ওর মনের পর্দা থেকে প্রায় সব অতীত স্মৃতি চেঁছে তুলে নেয়া। প্রায় বলছি এই জন্যে যে সবটুকু স্মৃতি তার তুলে নিতে পারতো, তাও সম্ভব, কিন্তু নেয়নি। নেয়নি, তার কারণ, নিলে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যেতো রানা।' এ কাজ কাদের, কি তাদের লক্ষ্য, আমি জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে তারা রানাকে সম্পূর্ণ পাগল করে দিতে চায়নি। চাইলে পারতো?'

'পারতো।' পপকিন যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কিন্তু কিভাবে? কিভাবে?'

পাল্টা প্রশ্ন করলো কোগিন। 'হিপনোসিস সম্পর্কে কিছু জানা আছে আপনার?'

খুক্ করে কাশলো জুনেস্কি। কপালের চামড়া টান টান করে তার দিকে তাকালো কোগিন। শান্তভাবে বললো, 'না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়—হিপনোসিস ঝাড়-ফুঁক বা ফুস মন্তর নয়। ড্রাগের সাহায্যে hypngogic অবস্থায় দীর্ঘ সময় রাখা হয়েছে রানাকে, এই সময় সুচতুর ভাবে তার মনটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নিজের নাম, নিজের চেহারা, মাতৃভাষা, ছোটবেলার একটা ঘটনা এবং শেষবার কোথায় ছিলো তা আংশিকভাবে মনে আছে ওর। এটুকুও রানার কৃতিত্ব নয়। যারা ওর ওপর এই অন্যায় করেছে তারাই চেয়েছে এগুলো স্মরণে থাকুক রানার, তা নাহলে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যাবে, এই ভয়ে।'

'বলে যান।'

'রানার মনের ভিতর অসংখ্য পাঁচিল তুলে দেয়া হয়েছে, এই সব বাধা টপকে ও যাতে নিজের আসল, পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানতে না পারে। শুধু তাই নয়, ভুয়া কিছু স্মৃতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওর মনে, যাতে নিজেকে চিনতে চেষ্টা করলে পথ ভুল করে, দিশেহারা হয়ে পড়ে, এবং ক্ষান্ত হয় সে প্রচেষ্টায়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : পরিষ্কার মনে আছে ওর, কিছুদিন আগে গলফ খেলেছে। কিন্তু সেই সাথে এও পরিষ্কার জানা আছে ওর যে জীবনে কখনো গলফ খেলেনি ও, খেলতে জানেই না। ব্যাপারটা সাংঘাতিক গোলমেলে নয়? ওরা চেয়েছেও তাই, গোলমালে প্যাঁচ খেয়ে একটা অচল অবস্থায় আটকা পড়ে থাকুক ওর মনটা। ওর ইচ্ছাশক্তি এখন পঙ্গু হতে বসেছে।'

'হিপনোসিসের দ্বারা এসব সম্ভব, বলছেন?' জানতে চাইলো জুনেস্কি।

'সম্ভব। এই কামরার মেঝেতে একটা কাল্পনিক চতুষ্কোণ এঁকে আপনাকে সম্মোহিত করে আমি যদি সাজেশন দিই চৌকো জায়গা-টাকে এড়িয়ে যেতে, নিজের অজান্তেই, সারাজীবন কখনো ওখানে পা ফেলবেন না আপনি দিনে হাজার বার এই কামরায় আসা-যাওয়া করলেও।'

কোনো প্রতিক্রিয়া নেই জুনেস্কির মুখে।

মৃদু হেসে কোগিন বললো, 'আপনি চাইলে আপনার ওপর সম্মোহন প্রয়োগ করে ব্যাপারটা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। এখুনি।'

'না-না!' দ্রুত বললো জুনেস্কি। 'আমি বিশ্বাস করি।'

'গো অন, ডক্টর,' একটু হেসে বললো পপকিন।

'মানুষের মন নিজস্ব একটা ধারায় নিজে থেকেই চালিত হয়,' বললো কোগিন। 'নিজেকে জানতে চাওয়া মনের বিশেষ একটা ধর্ম, সে তার ভিত্তিমূলে পৌঁছুতে চায়। এই নিজেকে জানার কাজটা সম্পন্ন হয় স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু এই সিঁড়িটাই কেড়ে নেয়া হয়েছে রানার কাছ থেকে। ফলে নিজেকে জানার জন্যে গভীর ভাবে চেষ্টা করলেই দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল দেখতে পাচ্ছে ও, কখনো বা গোলকধাঁধা দেখতে পাচ্ছে, ফলে শঙ্কায় জর্জরিত হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তন্দ্রার।' পপকিনের ভুরু কুঁচকে উঠেছে, লক্ষ্য করছে কোগিন। 'ঘুম এসে নিষ্কৃতি দিচ্ছে ওকে। এটা একটা টিপিক্যাল হিস্টিরিক্যাল সিম্পটম। আমার সাথে কথা বলার সময় দু'বার এই অবস্থা হয়েছে ওর। প্রতিবার মিনিট পনেরো ঘুমুতে দিয়েছি ওকে আমি। ঘুম ভাঙার পর কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার কারণ বলতে পারেনি, মন থেকে মুছে গেছে সব। পাগল হয়ে যাবার আশঙ্কা ঠেকিয়ে রাখছে এই ঘুমটা।'

'দু'টো ব্যাপার এখনো আমার কাছে পরিষ্কার নয়,' নড়েচড়ে বসলো পপকিন, বললো, 'এক আপনি বলছেন ওর ইচ্ছা শক্তি পঙ্গু হতে বসেছে। কিন্তু তাই যদি হবে, কিভাবে ও আমার একজন অত্যন্ত কৌশলী এবং উপযুক্ত লোককে বোকা বানিয়ে স্পাইরালে-নের মাথায় গিয়ে উঠলো, সেখানে কয়েকজন দুর্ধর্ষ লোককে কুপো-কাৎ করে একশো চল্লিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে নেমে এলো নিচে?'

'লোকটা কে, তা আমি জানি না' অত্যন্ত ভেবেচিন্তে, একটা একটা শব্দ উচ্চারণ করে উত্তরটা দিচ্ছে কোগিন। 'কিন্তু যতটুকু বুঝতে পেরেছি, সাংঘাতিক সক্রিয় এবং বুদ্ধিমান এক মানুষ সে।

ওর ইচ্ছা শক্তি পঙ্গু হতে বসেছে, এতে কোনো ভুল নেই, তবে সেটা শুধু নিজের পরিচয় খোঁজার ব্যাপারে সত্য। মনের পর্দায় এমন সব জটিল গোলমাল রয়েছে, দেখে শুনে হাল ছেড়ে দিতে চাইছে ও, উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। দ্বিতীয় ব্যাপার?'

'এই ঘুমটা…,'

'ওর ইচ্ছা শক্তি পুরোটা নষ্ট হতে বসেছে,' বললো কোগিন। 'ধীরে ধীরে। পুরোটা নষ্ট হয়ে গেলে নিজের পরিচয় খোঁজার আর কোনো চেষ্টাই ও করবে না। তখন আর এ ভাবে ঘুমিয়েও পড়বে না ও। অর্থাৎ, ওর সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হবে। জীবনে কখনো আর নিজেকে চিনতে পারবে না রানা। স্মৃতিভ্রংশ স্থায়ী হয়ে যাবে। চিকিৎসার অতীত একটা কেসে পরিণত হবে।'

'হুঁ,' পপকিন গম্ভীর। কি যেন ভাবছে। অবশ্যই তা রানার ভালমন্দ কোনো বিষয়ে নয়। রানা জীবনে কখনো আর নিজেকে চিনতে পারুক বা না পারুক, তার কিছু এসে যায় না।

'ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার,' বললো কোগিন। 'আপনি বললে আমি ব্যবস্থা করতে পারি।'

উঠে দাঁড়ালো পপকিন। 'ধন্যবাদ, ডক্টর কোগিন। এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়।'

কোগিনও উঠলো। 'কাল আরেকবার ওকে দেখতে চাই আমি। যতদুর আভাস পেয়েছি, অসৎ সাইকিয়াট্রিস্টের হাতে পড়ার আগে রানা সাংঘাতিক ভয়, আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলো। চেষ্টা করে দেখবো, আসল ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানা যায় কিনা।'

নিষ্করুণ একটু হাসলো পপকিন। 'চিন্তা করবেন না, যত্নের কোনো ত্রুটি হবে না ওর।'

ডক্টর ডান কোগিন চলে যেতে নিজের চেয়ারে আবার বসলো পপকিন। তাকালো জুনেস্কির দিকে।

'সব শেষ,' ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো জুনেস্কি। 'ফিলা-ডভ নেই, অপারেশনও নেই।'

কি যেন ভাবছে পপকিন। কোনো মন্তব্য করছে না।

'স্যার?'

ধীর গলায় বললো পপকিন, 'ভাবছি, ফিলাডভ হয়তো নেই, কিন্তু তার একটা ভালো বিকল্প তো রয়েছে আমার হাতে।'

বিস্ময় ফুটে উঠলো জুনেস্কির চেহারায়। 'আপনি বলতে চাই-ছেন, স্যার, ওর ওপর ভরসা করবেন? কিন্তু ডক্টর কোগিন এইমাত্র কি বলে গেলো মনে নেই আপনার? রানা যখন তখন ঘুমিয়ে পড়তে পারে...'

'কিন্তু পুরো পাগল কখনোই ও হবে না!' বললো পপকিন। 'এবং এই হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার কবল থেকেও ধীরে ধীরে মুক্তি পাবে ও।'

'তার মানে...'

'বেচার চাইছে রানাকে ওর আসল চেহারা ফিরিয়ে দিতে,' কর্কশ গলায় বললো পপকিন। 'আর কোগিন চাইছে ওর স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে। ওই যে কৌশলটা, সম্মোহন, ওটার সাহায্যে চিকিৎসা করতে দিলে কোগিন তা পারবেও। ব্যস, তাহলে আর কি, একমুখ হাসি নিয়ে বাপের নাম জপতে জপতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে রানা। কিন্তু, আমার কি অবস্থা হবে তা কি একবার ভেবে দেখেছো?' চোখ রাঙালো পপকিন। ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবলো। পরমুহূর্তে সরল হলো মুখের রেখাগুলো। সিদ্ধান্ত জানিয়ে

দ্রুত এবং গম্ভীরভাবে বললো, 'ওকে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

ঢোক গিললো জুনেস্কি। ইতস্তত করছে। 'স্যার, ভালো করে ভেবে...'

'দেখেছি,' বললো পপকিন। 'হেড অফিসকে এখনো যখন জানাইনি, সম্ভব হলে ভবিষ্যতেও জানাচ্ছি না। নির্দেশ এলে রানাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো অপারেশনে। ও ফিলাতভ নাকি মাসুদ রানা, তা যেন আমরাও কিছু জানি না, ধরতে পারিনি। শুধুমাত্র এই ভাবেই নিজের চামড়া বাঁচাতে পারবো আমি।'

জুনেস্কি আর স্টকটন পরস্পরের দিকে তাকালো। কারো মুখে কথা নেই।

'রানাকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখা হোক, বললো পপকিন। 'জুলি তো সারাক্ষণ ওর সাথে থাকছেই। হোটেলের বাইরে আরো লোক পাঠাও। এই নকলটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় রক্ষা কবচ। যাও তোমরা।'

হোটেলের গ্যারেজে নামিয়ে দিলো জুনেস্কি রানাকে। 'আমি আর ওপরে যাচ্ছি না। কাল পাঠিয়ে দেবো জুলিকে,' রিস্টওয়াচের দিকে তাকালো সে। 'কাল মানে আজ, গড, প্রায় পাঁচটা বাজে। আপনি সোজা বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ুন।'

গাড়িতে একটা কথাও বলেনি রানা। 'দাঁড়াও,' জুনেস্কিকে বললো ও, 'ডাক্তাররা যে আমাকে পরীক্ষা করলো, তার ফলাফল কি? পপকিন আমার সাথে দেখা করলো না কেন?'

'বস আপনার সাথে আগামীকাল দেখা করবেন,' বললো জুনেস্কি। 'সব ব্যাখ্যা করবেন তিনি।' একটু থামলো জুনেস্কি,

নিচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে ছেড়ে দিলো। 'কথা দিচ্ছি আপনাকে।'

'ঠিক আছে, বললো রানা। 'তর্ক করার প্রবৃত্তি নেই আমার। কিন্তু পপকিন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে সেটা আমি খুব সহজে মেনে নেবো না, কথাটা তাকে জানিয়ে দিও। আমার চেহারা এবং মন বদলের পর থেকে আশপাশে শুধু তোমাদেরকেই দেখছি, সুতরাং এর জন্যে আমি তোমাদেরকেই দায়ী করবো। গোটা ব্যাপারটা যদি ব্যাখ্যা করে আমাকে বোঝাতে না পারো তোমরা, বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।' কথা শেষ করে আর দাঁড়ালো না রানা। সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো।

দরজা খুলে লবিতে ঢুকলো রানা। স্যুটকেসের পাহাড় দেখলো একধারে। নবাগত বোর্ডারদের কল-কাকলিতে জায়গাটা সরগরম একদল অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরী ওরা। চঞ্চল প্রজাপতির মতো পাখনা মেলে উড়ে যাচ্ছে চারদিকে। এগিয়ে গিয়ে পোর্টারের কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালো রানা। পোর্টার বেচারা সারা রাত ডিউটি দিয়েছে, এখনো যন্ত্রের মতো কাজ করতে হচ্ছে তাকে। শেষ পর্যন্ত তার চোখ পড়লো রানার উপর।

'থ্রী-সিক্সটি, প্লিজ,' বললো রানা।

'ইয়েস, মিঃ ফিলাতভ,' হুক থেকে চাবির গোছা নামাচ্ছে পোর্টার।

অবাক বিস্ময়ে একটা মেয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেনি রানা। কিন্তু পেছন থেকে ঠাণ্ডা গলার আওয়াজটা পরিষ্কার কানে ঢুকলো ওর, 'ড্যাডি!'

চাবি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে রানা। হঠাৎ দেখলো মেয়েটাকে। ওর

দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, দেখেই রানা বুঝতে পারলো, ড্যাডি বলে ওকেই সম্বোধন করছে মেয়েটা।

দশ

প্রায় আঁৎকে উঠলো রানা। পিছিয়ে এসে অস্বীকার করতে চাইলো যে ও ফিৎজাভেড নয়, ভুল করেছে মেয়েটা। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারলো অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই, বিপদ তাতে বাড়বে বৈ কমবে না। নাইট পোর্টার কাছেই রয়েছে, ওর নাম জানে সে। নিজের পরিচয় অস্বীকার করলে মহা গোলমাল বেধে যাবে লবিতে। ভিতর ভিতর ককিয়ে উঠলো ওর মনটা। আবার এক অপরিচিতার সাথে একান্ত পরিচিতের ভান করতে হবে। এবার আর প্রেমিকা নয়—আপন কন্যা। পান থেকে চুন খসলে···

ইতিমধ্যে ষোলো সতেরো বছরের মেয়েটা এগিয়ে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে ওর গলা, পায়ের আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে চুমু খাচ্ছে কপালে। একটা আড়ষ্ট ভাব অনুভব করেই সম্ভবত ওকে ছেড়ে এক পা পিছিয়ে গেলো মেয়েটা। ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে নিষ্পাপ সরল মুখ থেকে হাসিটা। 'বাবা! কি হয়েছে

তোমার বাবা? শরীর খারাপ?'

অপ্রতিভ দেখাচ্ছে রানাকে। হাসতে চেষ্টা করছে। 'না, মানে, হ্যাঁ। শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না।'

'অসলোয় তুমি আছো জানতাম, কিন্তু এই হোটেলে আছো তা কল্পনাও করিনি। কিন্তু এতো ভোরে কোথাও...?'

ফুটফুটে তাজা ফুলের মতো লাগছে মেয়েটাকে। ঢোক গিললো রানা। 'এক বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে দেরি করে ফেলেছি।'

পরনে মোটরিঙ কোট, দেখে বুঝে নিলো রানা, গাড়ি চালিয়ে বহুদুর কোথাও থেকে এসেছে মেয়েটা। সাথে কেউ আছে নাকি? ওর মা? দ্রুত এদিকে ওদিক তাকালো রানা।

'আমার কামরা পেতে আরো অনেক সময় লাগবে,' বললো মেয়েটা। 'তোমার কামরায় চলো, একটু পরিষ্কার হয়ে নিই। চেহারাটা কেমন বিতিকিচ্ছি হয়েছে দেখছো তো?'

বয়স্কা কোনো মহিলাকে লবির কোথাও দেখতে পাচ্ছে না রানা। ফিলাতভের বউ এখানে নেই, এটা মস্ত একটা স্বস্তির কারণ। কিন্তু জিভটা একেবারে শুকিয়ে গেছে ওর। জবাব দিতে পারছে না।

বাপকে চুপ করে থাকতে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠলো মেয়েটার। 'কি হলো, বাবা? এই হোটেলেই আছো তো তুমি নাকি...ছুত্তোরি ছাই, নিশ্চয়ই এখানে আছো, তা নাহলে চাবি কেন তোমার হাতে?' জোর করে হাসছে মেয়েটা, বাবা ঠিক কি কারণে এমন আড়ষ্ট ব্যবহার করছে, বুঝে উঠতে পারছে না সে।

'একটা ফোন করতে হবে,' বললো রানা, পা বাড়ালো।

'কামরা থেকে করলেই তো পারো!'

'কাজটা সেরেই উঠি ওপরে,' না থেমে বললো রানা। ঘেরা বুথ

নেই, মাথার উপর শুধু প্লাস্টিকের হুড। তারই একটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। আড়চোখে লক্ষ্য করছে, বাপের সাথে এগিয়ে এসে ছয়-সাত হাত দূরে অধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

অপর প্রান্তে রিঙ হচ্ছে। কেউ ধরছে না রিসিভার। ছয় বার রিঙ হলো; তারপর রিসিভার তুললো কেউ। 'ইয়েস?'

নিচু গলায় বললো রানা, 'পপকিনকে চাই আমি।'

'শুনতে পাচ্ছি না। জোরে বলুন। আপনি কে বলছেন?'

গলা সামান্য একটু চড়ালো রানা। 'আমি পপকিনের সাথে কথা বলতে চাই।'

অপর প্রান্তের গলার স্বরে সন্দেহ। 'সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না। তিনি এইমাত্র বিছানায়...'

চাপা স্বরে বললো রানা, 'বিছানায় কি করে তা আমি শুনতে চাই না। তোলো তাকে। আমি রানা বলছি।'

দ্রুত নিঃশ্বাস আটকাবার একটা আওয়াজ পেলো রানা রিসিভারে। 'ও. কে.।'

দেড় মিনিটের মাথায় অপর প্রান্তে এলো পপকিন। উদ্বিগ্ন গলা তার, 'রানা?' সেই সাথে অবিশ্বাসের ছোঁয়া।

'গোলমাল দেখা দিয়েছে ফিলাতভের...

পপকিন উত্তেজিত। 'তুমি এই ফোনের নাম্বার পেলে কোত্থেকে?'

'পরে শুনবেন। সমস্যাটা...'

'এক্ষুণি বলো,' গলা কেঁপে গেলো পপকিনের। 'কে দিয়েছে তোমাকে এই ফোন নাম্বার?'

'ডাক্তাররা যে কামরায় দেখেছে আমাকে,' বললো রানা,

'ওখানে একটা টেলিফোন আছে। নাম্বারটা মনে রেখেছি।

'মাই গড।' পাঁচ সেকেণ্ড বিরতি নিলো পপকিন তারপর অপেক্ষাকৃত কোমল গলায় বললো 'কোগিন বলছিলো তুমি নাকি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, তার কথা বিশ্বাস করছি এখন। ঠিক আছে, এবার বলো, রানা, কি তোমার সমস্যা ?'

'ফিলাতভের এক মেয়ে এসে হাজির হয়েছে। ড্যাডি, ড্যাডি করছে।'

কানের পর্দা ফেটে যাবার অবস্থা হলো রানার, পপকিন আর্তচিৎকার করে উঠেছে। 'হোয়াট।'

খবরটা পপকিনের কাছেও বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, বুঝতে পেরে মুহূর্তের জন্যে খুশি হলো রানা। 'এখন আমি করবো কি, তাই বলুন।' চাপা, উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলো ও। ফিলাতভের মেয়ে আছে, আগে বলেননি কেন ? এরপর হয়তো পেছনে চিংড়ি পুটিগুলোকে নিয়ে ওদের বুড়ী মা হানা দেবে আমার কামরায়। ক'টা ছেলে-মেয়ে আমার, মিঃ পপকিন ?'

'ও গড! ও গড!' হতচকিত পপকিন। 'এক মিনিট অপেক্ষা করো, রানা।' অস্পষ্ট, বিস্ময় সূচক আওয়াজ পাচ্ছে রানা, পপকিন কথা বলছে কার সাথে যেন। একটু পর খুক্ খুক্ করে কাশলো সে। বললো, 'রানা ? ওর নাম লরেলি।'

'আর কিছু জানেন না ?'

'কিভাবে জানবো ?' অসহায় ভঙ্গিতে বললো পপকিন।

'কি আশ্চর্য!' রেগে উঠলো রানা। 'ওর সাথে কথা বলতে হবে না আমার ? ফিলাতভের ভূমিকায় যদি অভিনয় করে যেতে হয়, ওর সম্পর্কে সব জানতে হবে না আমাকে ? ও আমার মেয়ে!'

'কোথায় সে এখন?'

আড়চোখে তাকালো রানা। আরো এক পা এগিয়ে এসেছে লরেলি। ক্লান্ত মেয়েটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। 'মাত্র ছয় হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কামরায় যেতে চাইছে।'

'দেখি কি করা যায়,' বললো পপকিন। 'লাইনে থাকো।'

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!' আবার আড়চোখে তাকালো রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। এগিয়ে আসছে লরেলি। দু'চোখে একরাশ অভিযোগ আর অভিমান।

'লরেলি, মা, খুব ক্লান্ত লাগছে তোমার, বুঝতে পারছি,' বাপের উপযুক্ত একগাল স্নেহের হাসি হাসলো রানা। 'তোমার ব্যাগগুলো কোথায়? ওগুলো বরং···

'এক্ষুণি নিয়ে আসছি,' ছুটে চলে গেলো লরেলি।

সড় সড় করে ঘাম নামছে কানের পেছন দিয়ে, অনুভব করছে রানা। লাইনে ফিরে এলো পপকিন। 'মার্গারেট লরেলি ফিলাতভ—ফিলাতভের প্রথম পক্ষের মেয়ে ও, একমাত্র মেয়ে।'

'ওর মা বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, ফিলাতভের সাথে ডিভোর্সের পর আবার বিয়ে করেছে

'নাম?'

'প্যাট্রিসিয়া জোয়ান মেটফোর্ড, তার বর্তমান স্বামীর নাম জন হাওয়ার্ড মেটফোর্ড, একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি সে।'

'ফিলাতভের দ্বিতীয় স্ত্রী সম্পর্কে?'

'তার সাথেও ডিভোর্স হয়ে গেছে তিন বছর আগে। নাম ছিলো জেনেট ফিলাতভ।'

'লরেলি—পড়াশোনা করে? কোথায়? ওর হবি কি?'

'এসব কিছুই জানি না,' বললো পপকিন। 'ফিলাতভের ডোশিয়ারে এর বেশি কিছু নেই। আসল কথা, ওর মেয়ে সম্পর্কে আমরা তেমন কোনো খোঁজ নেইনি।'

'এখন নিন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। শুনুন, মিঃ পপকিন, শুধু দেশের স্বার্থে আপনার কথামতো ফিলাতভের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি আমি। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাদের অযোগ্যতা দেখে আমার ইচ্ছে হচ্ছে বেলুনটা ফাটিয়ে দিই

'কি! বিষম খেলো পপকিন। 'ওহ্, নো, রানা। লক্ষ্মী বাপ আমার, আমার সাথে আলোচনা না করে ও ধরনের কিছু করতে যেয়ো না, আই প্লীড টু ইউ। যাই করো, মাই ডিয়ার বয়, কাভারটা নষ্ট করো না।' ব্যাকুল আবেদনের সুরে বললো পপকিন।

'আমাকে আমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে,' কঠিন সুরে বললো রানা। 'কেন জানতে চাই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা যদি দিতে না পারেন...'

'আজকের দিনটা সময় দাও আমাকে, রানা।' আর্তস্বরে বললো পপকিন। 'কথা দিচ্ছি...'

'এবং ব্যাখ্যাটা যেন আমার গ্রহণযোগ্য হয়,' বললো রানা 'আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি: এসবের পেছনে আমার মাতৃভূমির বড় কোনো স্বার্থ জড়িত থাকলেই শুধু আমি ফিলাতভের ভূমিকায় অভিনয় করে যাবো, তা নাহলে...

'স্বার্থটা বিরাট, রানা,' বললো পপকিন। গম্ভীর গলায় কথা বলছে সে, ভেবেচিন্তে। 'এতবড় একটা ঝুঁকি নিচ্ছো তুমি, এর প্রতিদান তুমি পাবে। ইসরায়েলের প্রতিটি নাগরিক তোমার নামে জয়ধ্বনি দেবে বিশ্বাস করো। দেশ তোমাকে মাথায় তুলে রাখবে,'

বিদ্রোহী রানাকে যা খুশি তাই বলে শান্ত করতে চেষ্টা করছে সে।

'প্রতিদান আমার দরকার নেই, কেউ আমার নামে জয়ধ্বনি করুক তাও আমি চাই না,' জানিয়ে দিলো রানা। 'দেশের সেবা করতে পারা ভাগ্যের কথা। ওইটুকুই আমার লাভ।'

'ঠিক আছে বাবা,' পপকিন ঢোক গিলে বললো। 'আজকের মধ্যেই তোমাকে সব জানাবার চেষ্টা করবো আমি ইতিমধ্যে মেয়েটাকে যেভাবে হোক সামলে রাখো।'

'পারবো কিনা জানি না।'

'সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করো, তারপর ভাগ্যে যা আছে হবে। মেয়েটার সাথে ফিলাতভের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিলো না, এটা একটা ভরসার কথা। যতদুর জেনেছি, মায়ের সান্নিধ্যও খুব একটা পায়নি ও।'

'ও আসছে, এবার যেতে হয় আমাকে,' কথাটা বলে রিসিভার রেখে দিলো রান। বেরিয়ে এলো বাইরে।

'কারো সাথে যেন তর্ক করছিলে মনে হলো?' সামনে এসে দাঁড়ালো লরেলি। হাতে একটা লেদার ব্যাগ, কাঁধেও ঝুলছে একটা কাপড়ের ব্যাগ।

'তাই মনে হলো বুঝি?' মেয়ের হাত থেকে লেদার ব্যাগটা নিলো রানা।

'তুমি একটুও বদলাওনি, আব্বু,' ক্ষীণ একটা অভিযোগ প্রকাশ পেলো লরেলির গলার সুরে। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বললো না। মুখের চেহারায় একটা অভিমানের ছাপ। 'এই ভোর বেলা, বিদেশ বিভূঁই অসলোতে কার সাথে কথা কাটাকাটি করছিলে বলো তো?'

এলিভেটরের সামনে দাঁড়ালো ওরা। একটা বোতামে চাপ দিলো রানা। 'বাদ দাও ওসব কথা। কোত্থেকে এলে শোনা যাক।'

'বারজেন। রেন্ট-এ কার নিয়ে এসকারশনে বেরিয়েছি। কাল-কের প্রায় সবটা দিন এবং সারারাত ড্রাইভ করতে হয়েছে ওহ্, বাবা। আমি যে কি সাংঘাতিক ক্লান্ত।'

মৃদু গলায় জানতে চাইলো রানা, 'একাই বেরিয়ে পড়েছো?'

'দুষ্টু আব্বু।' আশা করেনি রানা, লরেলি দুম্ করে ওর পিঠে একট ঘুসি বসিয়ে দিলো। 'বয় ফ্রেণ্ডের খোঁজ নিচ্ছো, না? আব্বু, এসব পরে।' আবদারের সুরে বললো মেয়েটা। তোমার কামরায় গিয়েই আগে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দাও। তিনজনের নাস্তা একা খেতে পারবো এখন।'

আঁতকে ওঠার কৃত্রিম ভঙ্গি করলো রানা চোখ কপালে তুলে।

এলিভেটর থেকে নেমে লরেলি বললো, 'কেন যেন মনে হচ্ছে, আগের বাবা নও তুমি, অনেক বদলে গেছো।' গলার স্বরে খুশির আমেজ।

'বয়স বাড়ছে তো,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা। 'কতো বয়স হলো তোমার, বলো তো? হিসাবটা মনে থাকে না...'

'সেই পুরানো আব্বু।' অভিমানে কালো হয়ে গেলো লরেলির মুখের চেহারা। 'আমি যে তোমার মেয়ে, একথাটা যদি কোনদিন ভুলে যাও, মোটেও আশ্চর্য হবো না।' রানার থতমত চেহারা দেখে নিজেকে সামলে নিলো লরেলি। নিচের ঠোঁট কামড়ালো সে। 'দুঃ-খিত, আব্বু। আগামী হপ্তায় আমার জন্মদিন, সতেরোয় পড়ছি।'

'দুঃখ প্রকাশ করার দরকার নেই,' বললো রানা। 'দোষ আমার। সে যাই হোক, যথেষ্ট বড় হয়েছো তুমি, লরেলি—আমাকে আব্বু

না বলে আসুন বললেই তো পারো।'

অবাক হয়ে তাকালো লরেলি বাপের দিকে। বাপের কাছ থেকে চিরকাল অবহেলা আর অযত্ন পেয়ে এসেছে, হঠাৎ এই সম্মান এবং সাবালকত্বের স্বীকৃতি পাবে, ভুলেও কখনো আশা করেনি সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবার কপালে চুমু খেলো সে।

লক্ষ্য করলো রানা, চোখ দু'টো ছলছল করছে মেয়ের।

তালা খুলে কামরায় ঢুকলো রানা। 'এটা বেডরুম। সোজা যাও, বাঁ দিকে বাথরুম।'

কাঁধের ব্যাগটা বিছানায় নামিয়ে ছোটখাটো কিছু জিনিস বের করে নিয়ে সোজা এগিয়ে গেলো লরেলি বাথরুমের দিকে। 'ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেও না কিন্তু! এক্ষুণি আসছি আমি!'

বাথরুমের দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। লরেলির শেষ কথাটার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার। ফিলাতভ মেয়েটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে প্রায়ই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতো।

বাথরুমে পানির আওয়াজ হচ্ছে শুনে ক্রাডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিলো রানা। রুম থারটি সিক্স, থার্ড ফ্লোর থেকে বলছি। ফিলাতভের নামে কোনো মেসেজ—বা যাই কিছু থাকুক—সাথে সাথে পেতে চাই আমি।' রিসিভার রেখে দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালো রানা লরেলির লেদার ব্যাগটার দিকে।

বাথরুমে এখনো পানির শব্দ, সেদিকে একটা কান খাড়া রেখে দ্রুত হাতে ব্যাগটা খুললো রানা। সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে ভিতরটা। নীল রঙের ইসরায়েলি পাসপোর্টটা দেখেই তুলে নিলো সেটা, পাতা ওল্টাচ্ছে। লরেলির জন্ম-তারিখ, ২১শে জুলাই। ছাত্রী। একটা ট্রাভেলার্স চেক বই পেলো। প্রচুর টাকা রয়েছে লরেলির

হাতে। একটা এনভেলাপ পেলো, তাতে ক্রেডিট কার্ড আর ফটোগ্রাফ রয়েছে। খুঁটিয়ে দেখলো না, যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে লরেলি বাথরুম থেকে। ব্যাগের একটা ভিতরের পকেটে হাত গলিয়ে দিলো, চাবির একটা গোছা ঠেকলো হাতে। পকেটের চেন টেনে বন্ধ করে দিতে যাবে, এমন সময় বাথরুমে পানির শব্দটা থামলো। লরেলি যখন বেরোলো, আরাম কেদারায় বসে জ্যাকেট খুলছে রানা। 'মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠলো একবার,' বললো লরেলি।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো রানার। 'সে কি!' উঠে দাঁড়ালো ও। এগিয়ে গিয়ে একটা হাত ধরলো লরেলির। 'বসো। ফোন করবো ডাক্তারকে?'

অবাক হয়ে চেয়ে আছে মেয়েটা। হঠাৎ হাসলো সে। 'না, বাবা, তার দরকার নেই। একটানা অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়েছি কিনা, তাই এমন হচ্ছে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ছ'টার আগে তেমন কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না,' চিন্তিতভাবে বললো রানা। 'স্যাণ্ডউইচ আর কফি আনতে বলি? তারপর সময় হলে ফুল ব্রেকফাস্ট...'

'না, আব্বু। আমি বরং অপেক্ষা করবো।'

একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করলো রানা। 'তোমার মা কেমন আছে?'

'ভালোই তো! সুখেই আছে!' তাচ্ছিল্যের সাথে বললো লরেলি।

একটু ইতস্তত করে আবার একটা প্রশ্ন করল রানা, 'তোমার

স্টেপ ফাদার···মিঃ মেটফোর্ড কেমন আছেন ?'

'শেষবার গত বছর দেখা হয়েছে.' বললো লরেলি। 'পাঁচদিন ছিলাম ওদের কাছে। চারদিনই দু'জনের কেউ বাড়ি ছিলো না। মিঃ মেটফোর্ড তার অফিসে টাকা রোজগার করতে ব্যস্ত, আর মা ব্যস্ত সে টাকা খরচ করার কাজে। মেয়ের সাথে কথা বলবে তার সময় কোথায়।' শেষের দিকে গলাটা ধরে এলো ওর।

'হুঁ,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা। 'আমরা সবাই তোমার ওপর অন্যায় করেছি। ঠিক আছে, এসব ভুলে যেতে চেষ্টা করো, লরেলি। এখন থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে, অন্তত আমার তরফ থেকে।' মেয়েটার প্রতি অদ্ভুত একটা সহানুভূতি বোধ করছে রানা। 'ভালো কথা, এখানে আমি আছি তা তুমি জানলে কিভাবে ?'

'পরীক্ষার পর স্কুল ছুটি হয়ে গেলো, কোথায় যাবো ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না, তাই টস্ করলাম। হেড মানে তেলআবিব, টেল মানে লণ্ডন। হেড দেখে ফোন করলাম, তখনো অবশ্য মনস্থির করিনি। ভেবেছিলাম তোমার গলার আওয়াজ শুনে আগে বুঝতে চেষ্টা করবো তুমি খুশি হবে কিনা। কিন্তু উত্তর পেলাম তুমি নাকি অসলোয়। তাই সোজা চলে এলাম। না এলে ভুলই করতাম,' রানার গালে চুমু খেলো লরেলি। 'আমার আব্বু সে মানুষই নেই আর।'

হাসছে রানা।

'একটা সিগারেট দাও দিকি।' বলেই চোখ রাঙালো লরেলি। 'খবরদার। বারণ করার আগে জেনে রাখো, এ বছরই আমি কলেজে ঢুকতে যাচ্ছি— লরেলি এখন আর সেই খুকীটি নেই।' বলেই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। 'এক্সারসাইজ ধরেছো নাকি, আব্বু ? শরীরটা আগের চেয়ে যেন মজবুত দেখাচ্ছে ?'

'ওটাই যখন যুবক থাকার একমাত্র উপায়,' চোখ মটকে হাসলো রানা, 'সে যাক। তোমার আর সব খবর কি শুনতে পারি?'

বাঁ হাত মুঠো করে কিল দেখালো লরেলি। 'ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'

'আহা,' গোবেচারা ভাব করলো রানা, 'আমি কি আর শাসন করতে যাচ্ছি তোমাকে? বড় হচ্ছো, আমি শাসন করলেও তো...'

'শোনো তাহলে,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো লরেলি। 'ডেভিড। কলেজ থেকে এই বছরই বেরিয়েছে ও, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে বি. এস. সি তে। স্কলারশিপ নিয়ে চলে যাচ্ছে আমেরিকায়। কোর্স কমপ্লিট করে তেলআবিবে যখন ফিরবে আমি তখন ওখানেরই ভার্সিটিতে পড়ছি। আমার ডিগ্রী নেয়া হলেই দু'জন আমেরিকায় চলে যাবো...'

'এতো সব ঠিক হয়ে গেছে?'

'আমি কি ছাই জানতাম এসব শুনে তুমি রাগ করবে না।' লরেলি ঝট্ করে উঠে বসলো। 'কই, সিগারেট দাও।'

'নেই রে। পাইপ টানবি?'

'গড। সত্যি তুমি বদলেছো, নো ডাউট! থাক তাহলে।'

কথা বলতে বলতে আবার শুয়ে পড়লো লরেলি, এবং একটু পরই তার কাছ থেকে হঠাৎ কোনো সাড়া না পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো রানা, ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো রানা। জ্যাকেটটা চড়ালো গায়ে। লরেলির দিকে একবার তাকালো। হাসি হাসি মুখ, কিন্তু ঘুমাচ্ছে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো কাপড়ের ব্যাগটা। লেদার ব্যাগটা হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো বাইরে।

নিচে নেমে পোর্টারকে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, ওর মেয়ে লরেলি একটা রুম রিজার্ভ করেছে, চারতলায়, ত্রিশ নম্বর কামরা। চাবিটা চেয়ে নিলো ও।

লরেলির রুমে ব্যাগ দু'টো রেখে মেঝেতে দাঁড়িয়ে মাথার পেছনটা চুলকাচ্ছে রানা। যে মেয়ে ওকে বাপ ডাকছে তার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা কি উচিত হবে? কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপন মনে হাসলো রানা। উদ্দেশ্যটা তো আর খারাপ কিছু নয়, এতে দোষ নেই। আগে দরজাটা বন্ধ করে নিলো ও। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে ব্যাগ দু'টো ভালো করে পরীক্ষা করতে শুরু করলো। তথ্য তেমন কিছুই পাওয়া গেলো না। ওর—ওর নয়, ফিলাডভের একটা ছবি পেলো। একটা খেলনা ভাল্লুক পেলো। অনেক দিনের পুরানো, বোঝা যায়। এক কালে এটার রঙ ছিলো সবুজ, এখন কালো হয়ে গেছে। কয়েকটা বই পেলো রানা। গম্ভীর হয়ে উঠলো মুখটা। এ ধরনের বই পড়ার বয়স এখনো হয়নি লরেলির, ভাবলো ও, আভাসে হলেও কথাটা ওকে জানিয়ে দিতে হবে।

ব্যাগ দু'টো র‍্যাকে তুলে রাখলো রানা। দরজা খুলে বাইরে বেরুতেই পাঁচজনের সামনে পড়ে গেলো। গম্ভীর, উদ্বেগে ভারি মুখ। জুনেস্কি, স্টকটন—বাকি তিনজনকে রানা চেনে না। ওকে দেখে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

'কি ব্যাপার?'

উত্তর না দিয়ে সঙ্গীদেরকে নীরব ইঙ্গিত দিলো জুনেস্কি। অ্যাবাউট টার্ণ হয়ে চারজনই করিডোর ধরে দ্রুত চলে গেলো। রানার আপাদমস্তক দেখলো জুনেস্কি। রাগে ফুলে আছে সে, বুঝলো রানা। কিন্তু গ্রাহ্য করলো না।

‘সঙ সেজে দাঁড়িয়ে আছো কি মনে করে?’

‘আপনি আমাদেরকে পাগল করে ছাড়বেন দেখছি,’ অতি কষ্টে, অনেকটা বাধ্য হয়ে, নিজেকে সংযত রাখছে জুনেস্কি। ‘আমরা ডজন খানেক লোক ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছি, এদিকে প্রতি পদে আপনি আমাদের সাথে অসহযোগিতা করছেন।’

‘শেষ হয়েছে লেকচার?’ হঠাৎ রক্ত চড়ে গেলো রানার মাথায়। গলা চড়িয়ে কার সাথে কথা বলছো তুমি? পপকিন কোথায়? যদি কিছু বলার থাকে, তাকে পাঠিয়ে দাও আমার কামরায়,’ বলেই জুনেস্কিকে পাশ কাটিয়ে এগোলো রানা।

থতমত খেয়ে এক সেকেণ্ড সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো জুনেস্কি, পরমুহূর্তে রানাকে দ্রুত অনুসরণ করলো সে। ‘মিঃ ফিলা…’

হঠাৎ ব্রেক কষলো রানা, চরকির মতো আধপাক ঘুরলো। জুনেস্কি কিছু বোঝার আগে চটাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিলো রানা। ‘ওই নামে আরেকবার ডাকো আমাকে,’ শান্ত, নিরুত্তাপ গলায় বললো ও, ‘টেনে ছিঁড়ে নেবো জিভটা।’

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না জুনেস্কি। রানা ওকে মেরেছে, আবার বলছে ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবে, দু’টোই অবিশ্বাস্য লাগছে ওর কাছে। ছয় ফিটের উপর লম্বা, অসুরের শক্তি শরীরে, রুখে দাঁড়ালে যে জুনেস্কির সামনে থেকে আট দশজনের একটা গুণ্ডা দল পালাতে দিশে পায় না, তার গায়ে হাত তুলেছে রানা!

কুঁকড়ে গেছে জুনেস্কি। ভয়ে নয়, একটা সমীহ ভাব অনুভব করছে। ‘দুঃখিত, মিঃ রানা,’ ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললো সে। ‘কিন্তু…আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমরা…’

'কার নিরাপত্তা? আমার, না ফিলাতভের?' চাপা কণ্ঠে বললো রানা। 'তোমরা আমাকে কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারছি, হামলা করার জন্যে একটা নয়, বেশ কয়েকটা দল আশপাশে সুযোগের অপেক্ষায় ওত্ পেতে আছে। তাদের লক্ষ্য ফিলাতভ, আমি নই। এবং তোমরা জানো, আমি ফিলাতভ নই। এরা কারা, জানি না। এদের কি উদ্দেশ্য তাও জানি না।' মৃদু হাসলো রানা। 'কিন্তু ফিলাতভকে তারা খুন করতে চায় না, এটুকু জানি।'

'জানেন? কি ভাবে

'চাইলে অনেক আগেই পারতো। স্পাইরালটোপেনের মাথায়, পথে, নিচের লবিতে, করিডোরে, জানালা দিয়ে কামরার ভিতর—গুলি করার অনেক সুযোগ পেয়েছে তারা। কিন্তু করেনি। ওরা আমাকে কিডন্যাপ করতে চাইছে। সে যাই হোক, এসব ব্যাপারে তোমরা যতক্ষণ আমাকে সব কথা না জানাচ্ছো, ততক্ষণ আমার কাছ থেকে সহযোগিতা পাবার আশা করতে পারো না।'

'বস্ বলেছেন সম্ভব হলে আজকেই তিনি সব কথা খুলে··' রানা আবার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে জুনেস্কি পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে ছুটলো ওর পিছু পিছু, 'মিঃ রানা, বস্ এটা আপনাকে দিতে বলেছেন।'

দাঁড়ালো রানা। এনভেলাপটা নিলো। খুলে ভিতর থেকে বের করলো এক শীট কাগজ। কাগজটা টাইপ করা। দ্রুত চোখ বুলালো ও। এনভেলাপসহ কাগজটা মুচড়ে গুঁজে দিলো জুনেস্কির হাতে। 'লরেলি সম্পর্কে এখানে যা আছে তার চেয়ে বেশি তথ্য ইতিমধ্যে আমি নিজেই যোগাড় করেছি। পপকিনকে গিয়ে বলো, ওর সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে চাই আমি।'

পকেট থেকে হাত বের করে মাথা চুলকাচ্ছে জুনেস্কি। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা তো করে যাচ্ছি···

'পপকিন বলেছিলো ফিলাতভের একটা ডোশিয়ার দেবে আমাকে,' বললো রানা। 'সেটার কি হলো?'

'সেটা সম্পর্কে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি,' গলা খাদে নামিয়ে ইতস্তত করতে করতে বলছে জুনেস্কি। 'টপ সিক্রেট একটা মিশনে রওনা হবার কথা ছিলো ডক্টর ফিলাতভের। তার গুরুত্ব কতটা···মানে, তার সম্পর্কে একমাত্র বস্ ছাড়া আমরাও কেউ তেমন কিছু জানি না।'

'তার মানে তোমাদেরকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করা হচ্ছে না?'

সায় দিয়ে দ্রুত মাথা ঝাঁকালো জুনেস্কি। 'জ্বী জ্বী।' উৎকণ্ঠিত। 'এই তো ঠিক বুঝেছেন ব্যাপারটা। সিকিউরিটি বলে একটা কথা আছে তো। এতোই টপ সিক্রেট ব্যাপার যে···

জুনেস্কির কথা কেড়ে নিয়ে বললো রানা, 'আমাকেও জানানো চলে না—এই বলতে চাইছো?' ঝট্ করে একটা হাত তুলে জুনেস্কির শার্টের কলার মুঠো করে ধরে তীব্র এক ঝাঁকুনি দিলো রানা। 'গরু! ঘাস খেয়ে মাথায় শুধু গোবর জমা করেছো। সিকিউরিটি? আমিই তো এখন তোদের একমাত্র সিকিউরিটি!' আরেকটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিলো ও জুনেস্কির শার্টের কলার। 'মনে থাকে যেন, এই কথাটা পপকিনের কানে ওঠা চাই।' বলে আর দাঁড়ালো না রানা।

বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। হতভম্ব হয়ে গেছে সে। একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠছে চেহারায়।

নিজের কামরায় ঢুকে নিঃশব্দে বন্ধ করলো রানা দরজাটা। পেছন ফিরে দেখলো মেয়েটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোট্ট হয়ে শুয়ে আছে। হাত

হু'টো কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করা, মুঠো পাকানো, মুঠো হু'টো কণ্ঠার কাছে পড়ে আছে। বালিশ থেকে নেমে গেছে মাথা, লক্ষ্য করে এগোলো রানা। বিছানায় বসে হু'হাত দিয়ে লরেলির মাথাটা ধরে আলতো ভাবে তুলতে চেষ্টা করছে।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলো লরেলি।

থতমত খেয়ে হাত হু'টো কোলের উপর টেনে নিলো রানা।

'বাবা!' রানার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে লরেলি। অবিশ্বাস্য কিছু যেন ধরা পড়েছে তার চোখে। 'তুমি...!' কথা বলতে পারছে না মেয়েটা। বিস্ময়টা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, প্রায় আঘাত হয়ে লেগেছে ওকে।

অবস্থা খারাপ রানার। লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না, আমতা আমতা করছে। 'আমি···মানে ...লরেলি তুমি ·····মানে···

বিস্ফারিত চোখে দেখছে রানাকে লরেলি। হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়ে বসলো সে। 'আব্বু! 'চিৎকার করে উঠেই সে উন্মাদিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো রানার বুকে। হু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। হাউমাউ করে কাঁদছে। ফুলে ফুলে উঠছে পিঠটা।

ঢোক গিলছে রানা। স্রেফ বোকা বনে গেছে। ঠিক কি যে ঘটছে, বুঝছে না। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করবে কিনা ভাবছে, এমন সময় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো লরেলি, 'তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিলাম আমি, আজও জানি না। মাকে তুমি ঘৃণা করতে, তার কারণটা বড় হয়ে বুঝেছি। কিন্তু সেই ছোট বেলা থেকে আমাকেও তুমি ঘৃণা করে এসেছো···না, অস্বীকার করো না, বাবা! আমি জানি, তা তুমিও জানো? জেনেও দয়া হয়নি তোমার। কখনো কাছে ডেকে

দু'টো আদরের কথা বলোনি। কিন্তু আজ তোমার এই পরিবর্তন··· মনে আছে, সিঁড়ি দিয়ে পড়ে হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে ফেলেছিলাম একবার। ইস্! সে কি রক্ত। আমি তবু কাঁদিনি। কিন্তু তুমি যখন রেগে চড় মারলে, চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম। তুমি আমার সেই বাপ! আজ আদর করে বালিশে মাথা তুলে দিচ্ছো—দেখেও কিভাবে বিশ্বাস হয়, বলো?

কখন থেকে জানে না রানা, নিজের অজান্তে লরেলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করেছে ও। 'বয়স হলে মানুষ বদলায়, লরেলি। বুড়ো খোকা তাই অন্যায় আচরণের জন্যে অনুতপ্ত। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হোক। তুমি কি বলো?'

রানার বুক থেকে মুখ তুললো লরেলি। ফর্সা মুখটা লাল, চোখের পানিতে ভিজে। হাসছে। 'আমি বলি, আমার বাবা কোনদিন আমার সাথে অন্যায় আচরণ করেনি। তাই ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। বাবা আমাকে চিরকালই ভালবাসতো, কিন্তু দুষ্টু বাবা তা জান্‌তে দিতে চায়নি, পাছে লাই পেয়ে মাথায় চড়ে বসি ··'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো রানা, ওর সাথে হেসে উঠলো লরেলিও।

হঠাৎ বন্ করে ঘুরে উঠলো মাথাটা। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরই আবার সুস্থ বোধ করলো রানা। রাত জাগার ফল বুঝি। ভাবলো ও। দরজার দিকে তাকালো একবার। নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হচ্ছে। পপকিন আর তার চ্যালা চামুণ্ডাদের উপর ভরসা কি! ওদের কড়া পাহারার নমুনা যে কি ফিলাতভই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাকে সরিয়ে ফেলে আরেক লোককে রেখে যাওয়া

হয়েছে, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। ও যদি নিজেকে মাসুদ রানা বলে দাবি না করতো এখনো কিছু জানা হতো না ওদের। একদল গরু, ঘাস খায়।

পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে রানা। আজকের দিনটা শেষ সুযোগ হিসেবে দান করতে যাচ্ছে ও পপকিনকে। সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা যদি সে না দিতে পারে, সোজা জেনেভায় চলে যাবে ও, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির সামনে হাজির করবে নিজেকে। অথবা কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা চলে যাবে তেল-আবিবে। নিজের পরিচয় নিজেই তদন্ত করে বের করার চেষ্টা করবে। জানতে হবে, ওর এই দুর্দশার জন্যে কে দায়ী। যে বা যারাই দায়ী হোক, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য যদি গ্রহণযোগ্য হয়, ভালো। আর তা যদি না হয়, দেখে নেবে ও।

সেই সাথে একটা কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবে ও। জানতে চেষ্টা করবে ফিলাতভ কোথায়।

লরেলির জন্যে দুঃখ বোধ করছে। খানিক আগে রেখে এসেছে তাকে তার কামরায়। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে যাবে ওর সাথে। তার সব আবদার এখন রক্ষা করে যেতে হবে ওকে।

'চিক, চিক!' ঝট্ করে জানালার দিকে তাকালো রানা। হঠাৎ মাথাটা বন করে ঘুরে উঠলো আবার, তবে দ্রুত সামলে নিলো নিজেকে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, নিচের দিকে তাকা-তেই কয়েকটা চড়ুই পাখিকে সভায় বসে থাকতে দেখলো কার্নিশের উপর। আরো নিচে বাগান। ফুল ফুটেছে। রাত পোহাচ্ছে।

ব্যথা শুরু হলো মাথায়। 'ইশ্, তেলআবিবে আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম, আবার যদি সব মনে করতে পারতাম,' স্বগতোক্তি

করলো ও। 'গড হেলপ মি!' বাড়ছে মাথা ব্যথাটা। ঘুরছে। একটা আচ্ছন্ন ভাব অনুভব করছে ও। হঠাৎ দ্রুত হয়ে উঠছে সময়ের প্রবাহ। নেশা করলে এমন হয়। সব কিছু বড় তাড়াতাড়ি ঘটে যাচ্ছে। সাবধান হতে চাইছে রানা, কিন্তু সময়ের সাথে পেরে উঠছে না। ধীরে ধীরে একটা আচ্ছন্ন বোধ গ্রাস করতে চাইছে ওকে। 'চি্‌ক, চি্‌ক!' চড়ুই পাখিগুলো কান ঝালাপালা করে ছাড়লো। বাগানে ফুল। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল…' হঠাৎ মনের মধ্যে বাজতে শুরু করলো একটা মিষ্টি কবিতার কলি।

বিপদটা টের পেয়ে গেলো রানা। সম্মোহিত হয়ে পড়ছে ও। যান্ত্রিক সাজেশনের মতো কানে বাজছে,' কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিলো…'

টলছে রানা। ইতিমধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মাতালের মতো এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে·· একটু একটু করে এগোচ্ছে বিছানার দিকে। পৌঁছুতে পারবে? কিভাবে যেন জানতে পেরেছে ও, গভীর হিপ-নটিক ট্রান্স সোমনামবুলিজমে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে।

থরথর করে কাঁপছে শরীর। ঘামে ভিজে গেছে মুখ। হাঁপাচ্ছে। আছাড় খেয়ে পড়ে গেলো সে বিছানার উপর। তারপর চলে গেলো স্বপ্নের জগতে।

কাঁচাপাকা একজোড়া ভুরু দেখতে পাচ্ছে রানা। সুন্দরভাবে সাজানো একটা কামরা। তীক্ষ্ণ চেহারার এক বৃদ্ধ। ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন একটা পিঠ উঁচু রিভলভিং চেয়ারে। চেয়ে রয়েছেন ওর চোখের দিকে।

'ওঠো শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ' গম্ভীর কণ্ঠস্বর। আবৃত্তি করছেন ভদ্রলোক, প্রতিটা শব্দ

গেঁথে যাচ্ছে মনের গভীরে।

স্বপ্নটা কতক্ষণ ধরে দেখেছে রানা, তারপর কতক্ষণ গভীর ভাবে ঘুমিয়েছে, কিছুই বলতে পারবে না ও। ঘুম ভাঙলো মুহুর্মুহু করাঘাতের শব্দে।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো সে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলেও অদ্ভুত একটা প্রশান্তিতে ভরে রয়েছে মন এবং শরীর, অনুভব করলো ও। কানে এখনো বাজছে আবৃত্তির সুরটা, 'ওঠো শিশু মুখ ধোও, পরো নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।' কি মিষ্টি ভাষা! ভাবলো ও। মুচকি একটু হাসলো আপন মনে। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ ঝরে গেছে শরীর থেকে। শূন্যে ডানা মেলে দেয়া মুক্ত বিহঙ্গের মতো হালকা লাগছে নিজেকে। জীবনটা যেন নতুন একটা তাজা গোলাপ ফুল।

এগারো

দু'বার পড়লো পপকিন টেলিগ্রামটা। বোধগম্য হচ্ছে না। হেড অফিস ঠাট্টা করছে, নাকি এটা তাদের ভুলের একটা নমুনা? ভুরু কুঁচকে হাতের টেলিগ্রামটার দিকে তাকালো আবার: উত্তর দিতে

এতো দেরি হবার কারণ কি? কোগিনের রিপোর্ট পাঠাচ্ছো না কেন?

কিসের উত্তর চাইছে হেডকোয়ার্টার? শেষবার তারা যে নোট পাঠিয়েছিলো তাতে নির্দেশ ছিলো: অপেক্ষা করো। পরবর্তী নির্দেশ যাচ্ছে।

কোথায় সেই পরবর্তী নির্দেশ? নির্দেশ না দিয়ে উত্তর চাইছে। এর মানে কি? তারপর—কোগিনের রিপোর্ট বলতে কি বোঝাতে চাইছে?

কোগিনের এখন লণ্ডন থাকার কথা। হেডকোয়ার্টারের কর্তা ব্যক্তিরা জানে না, জানার কথা নয়, পপকিন তাকে ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠিয়ে অসলোয় আনিয়েছে। তাহলে? কোগিনের প্রসঙ্গ তুলছে কেন? কি রিপোর্ট দেবে সে?

ডেস্কের বাঁ পাশে তিনটে টেলিফোন। সেদিকে তাকালো পপকিন। এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। দরজার দিকে চোখ তুললো। ইণ্টারকমের দিকে বাড়িয়ে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে নিলো হাতটা। সন্দেহ ঢুকেছে মনে। অন্তরাত্মা কেঁপে গেলো পপকিনের। চোখ দু'টো বিস্ফারিত। অসম্ভব একটা কল্পনা, কিন্তু সত্যি হতেও পারে।

নির্দেশ হয়তো এসেছে। হয়তো তারই প্রেক্ষিতে উত্তর চাইছে হেড অফিস। হয়তো সেই নির্দেশনামাতেই কোগিনকে কোনো ব্যাপারে রিপোর্ট তৈরি করে পাঠাতে বলা হয়েছে। কিন্তু সেই নির্দেশপত্র ওর হাতে পৌঁছায়নি।

দরদর করে ঘামছে পপকিন। সন্দেহটা যদি সত্যি হয়, সর্বনাশ হতে বাকি নেই কিছু। যা ক্ষতি তা তো হয়েছেই, তারচেয়ে বড় কথা, দুতাবাসে বিশ্বাসঘাতক রয়েছে কেউ, তাকে খুঁজে বের করতে

হবে।

গলা শুকিয়ে গেছে পপকিনের। ঢোক গিলে ইন্টারকমের সুইচ অন করলো। 'এক গ্লাস পানি। আর জুনেস্কিকে বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে আসতে বলো। জরুরী।'

চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলো পপকিন। হার্টবিট বেড়ে গেছে ওর। অসহ্য অস্থিরতা বোধ করছে। ভাবছে: সম্ভব? টপ্ সিক্রেট চিঠিপত্র সব ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে আসে। আসার পথে খোয়া যাবার প্রশ্নই নেই। দূতাবাসে পৌঁছাবেই। আর দূতাবাসে পৌঁছুলে তা হারিয়ে যেতে পারে না। একটা পিন পর্যন্ত হারাবার উপায় নেই, কখনো হারায়নি। না হারাতে পারে না। চুরি? হ্যাঁ।

কে?

নক হলো দরজায়। জবাব দিলো না পপকিন। চেয়ারে গিয়ে বসলো। বাক্স থেকে চুরুট টেনে নিয়ে ধরাচ্ছে। কামরায় ঢুকে দরজাটা এক হাতে বন্ধ করছে জুনেস্কি। ঘুরে দাঁড়ালো। হাতে পানি ভর্তি গ্লাস। এগিয়ে আসছে।

টেলিগ্রামটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারলো পপকিন। বললো, 'পড়ে দেখে বলো এর অর্থ কি।'

উড়ে এসে জুনেস্কির পায়ের কাছে পড়েছে কাগজের টুকরোটা। নিচু হয়ে তুলে নিলো সেটা। এগিয়ে এসে ডেস্কের উপর গ্লাসটা রাখলো। বসের দিকে তাকালো একবার। চুরুট ধরাচ্ছে। দৃষ্টি এড়ালো না, হাত দু'টো কাঁপছে তার।

বুকটা দুরু দুরু করে উঠলো জুনেস্কির। সাংঘাতিক কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। চোখের সামনে তুললো টেলিগ্রামটা।

প্রথম লাইনটাই ঘোল খাইয়ে দিলো জুনেস্কিকে। মুখ তুলে

আরেকবার তাকালো বসের দিকে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে দেখে দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিলো।

দ্বিতীয় বাক্যটি পড়ছে জুনেস্কি। বরফের নিষ্প্রাণ মূর্তি হয়ে গেছে যেন সে।

প্রচণ্ড এক ধমকের ধাক্কায় সেই বরফ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবার উপক্রম হলো। 'চুপ করে আছো কেন? কি বুঝলে বলো।'

মুখ তুললো জুনেস্কি। বেকুব দেখাচ্ছে তাকে। 'মনে হচ্ছে একটা প্রশ্ন করেছিলো ওরা, যার উত্তর পায়নি, স্যার।'

'কি প্রশ্ন? কোথায় সেই প্রশ্ন?' হুড়মুড় করে কয়েকটা প্রশ্ন বেরিয়ে এলো পপকিনের অধৈর্য কণ্ঠ থেকে। 'কাকে করেছে? কবে করেছে? জানো কিছু?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে জুনেস্কি।

'তুমি জানো না। আমিও জানি না। কে জানে, জুনেস্কি?'

প্রশ্নটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে ঢোক গিললো জুনেস্কি। 'সব চিঠিপত্র মিস এলিজার কাছ থেকে নিয়ে এসে আমিই আপনাকে দিই—কিন্তু, স্যার, সে নিশ্চয়ই এই চিঠিটা দেয়নি আমাকে।' টেলিগ্রামটা আরেকবার পড়লো সে। 'প্রশ্ন দেখে মনে হচ্ছে···হ্যাঁ, একটা চিঠি এসেছে, কিন্তু সেটা আমাদের হাতে পড়েনি।' ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবলো সে। স্যার, সব চিঠি আপনার ড্রয়ারেই তো রাখি। দেখেছেন ভালো করে? আপনি যখন লণ্ডনে ছিলেন···'

'দেখেছি। নেই।'

'আমি একবার দেখবো?'

মাথা হেলিয়ে অনুমতি দিলো পপকিন। ডেস্ক ঘুরে গিয়ে রিভলভিং চেয়ারটার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলো জুনেস্কি। ধীরে

ধীরে টান দিয়ে দেরাজটা বের করলো, নামিয়ে রাখলো কার্পেটের উপর। তারপর দেরাজ থেকে ফাইল আর এনভেলাপগুলো নামাতে শুরু করলো।

'এসব আমি দেখেছি,' বললো পপকিন। 'মিস এলিজাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবো?'

মুখ তুলে বসের দিকে তাকালো জুনেস্কি। চোখের কোণে সাদা মতো কি যেন ধরা পড়লো তার। 'আগে বরং খুঁজে দেখি...' উত্তরটা দেবার ফাঁকেই এইমাত্র ডেস্কের যেখান থেকে দেরাজটা নামিয়েছে সেই ফোঁকরে হাত চালিয়ে দিয়েছে জুনেস্কি। কি যেন চোখের কোণে ধরা পড়েছিলো একটা ওদিকে। ড্রয়ারের ওপর চায়ের কাপ রাখার যে তক্তাটা, টানলে বেরিয়ে আসে, তারই ফাঁকে আটকে রয়েছে। কাঠের খরখরে গা, এর মধ্যে মসৃণ কি যেন ঠেকলো আঙুলের ডগায়। টেনে বের করলো জিনিসটা। একটা এনভেলাপ। চোখের সামনে তুলেই দেখতে পেলো বড় বড় অক্ষরে লাল কালিতে লেখা: টপ সিক্রেট। এই তো পেয়েছি, স্যার!' প্রায় লাফ দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো জুনেস্কি।

'দেখি,' রিভলভিং চেয়ারের একদিকে কাত হয়ে পড়লো পপকিনের শরীরটা। ব্যগ্র হাতে জুনেস্কির হাত থেকে নিলো এনভেলাপটা।

দ্রুত খোলা হলো এনভেলাপ। ডেস্ক ঘুরে ওপাশের চেয়ারে গিয়ে বসলো জুনেস্কি। কয়েকটা কাগজের শীট বের লো এনভেলাপ থেকে। ডেস্কের উপর সেগুলো বিছালো পপকিন। ঝুঁকে পড়লো এক নম্বর কাগজটার উপর। টাইপ করা একটা চিঠি। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

টপ সিক্রেট তারিখ···

বিষয় : অপারেশন এক্স-রে

ক) ডক্টর আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভের বিকল্প পাঠানো হচ্ছে।

খ) আসল ডক্টর আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভকে হেলআবিবে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে।

গ(অপারেশন এক্স-রে মিশন অপরিবর্তিত থাকবে।

ব্যাখ্যা :

ক) আগের পরিকল্পনায় ছিলো ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে ফিনল্যাণ্ডে যাবে তুমি। এখন আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে নয়, নকল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে ফিনল্যাণ্ডে যাবে। ওখানে ডক্টর ফিলাতভের যে কাজ ছিলো তা নকল ফিলাতভকে দিয়ে করাবে। এরপর তাকে অন্য কোনো দিকে পাঠিয়ে দেবে। সাথে থাকবে তোমার কয়েকজন যোগ্য লোক। নিঃসন্দেহে শত্রুপক্ষরা ওকে অনুসরণ করবে। সেই ফাঁকে আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে তুমি তোমার আসল কাজ উদ্ধার করবে।

এই নকল ফিলাতভের আসল পরিচয় নিচে দেয়া হলো। দেশের দোহাই দিয়ে এর কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া সহজ হবে। নিজেকে ও মাসুদ রানা এবং ইসরায়েলি হিসেবে জানে। বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসটা যাতে কোনো মতে না ভাঙে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। একে দিয়ে যতটা সম্ভব কাজ উদ্ধার করে নেবে, এবং প্রয়োজন ফুরালেই বিনা দ্বিধায় হত্যা করবে।

খ) আসল ডক্টর ফিলাতভ আপাততঃ আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকছে। নকল ফিলাতভকে ডাইভারশনে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি প্রথমে নিশ্চিন্ত হবে শত্রুপক্ষের সকলের নজর ওর উপর পড়েছে কিনা, এবং

তারা ওকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে তুমি আমাদেরকে সিগন্যাল পাঠালেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে আসল ডক্টর ফিলাতভকে।

গ) আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে তুমি আমাদের অরিজিন্যাল প্ল্যান অনুযায়ী রওনা হয়ে যাবে অপারেশন এক্স রে মিশনে।

নকল ফিলাতভের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

ওর নাম মাসুদ রানা। বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষতম স্পাই। ইসরায়েলের পরম শত্রু। এরই মধ্যে বিপুল ক্ষতি করেছে আমাদের। এ লোক সুযোগ পেলে একের পর এক আরো অনেক ক্ষতি করবে। ইসরায়েলের এতো বড় শত্রু খুব কমই আছে।

মাসুদ রানার চেহারা বদল করার সাথে সাথে ওর অতীত স্মৃতি কেড়ে নেয়া হয়েছে। নিজের নাম, ছোটবেলার একটা স্মৃতি, স্মৃতি হারাবার ঠিক আগের দিনের কিছু আংশিক ঘটনা, এবং নিজের চেহারা ছাড়া কিছুই মনে নেই ওর। যাতে পাগল হয়ে না যায় তাই কিছু কিছু স্মৃতি ওর মনের পর্দা থেকে মুছে ফেলা হয়নি। এবং, ওর ইচ্ছা শক্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য কিছু ভুয়া স্মৃতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওর মনে।

জীবনে কখনো স্মৃতি ফিরে পাবার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই ওর নেই। লণ্ডন থেকে সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর কোগিনকে আনিয়ে নাও। যদি দেখো আমাদের পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন দুর্বল হয়ে আসছে, তাহলে কোগিনকে দিয়ে আবার ওর ব্রেন ওয়াশ করিয়ে নাও এবং রিপোর্ট করো।

বিঃ দ্রঃ

মাসুদ রানা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ভয়ঙ্কর লোক। বাতাসে বিপদের গন্ধ পায়। সুতরাং সাবধান। যা করবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করবে।

[৪, ৫ এবং ৬নং পৃষ্ঠায় মাসুদ রানার পূর্ণাঙ্গ ডোশিয়ার দেয়া হলো।]

'ব্রেন একটা!' চিঠি থেকে মুখ তুলে বললো পপকিন। শেষ তিনটে পাতা রেখে বাকিগুলো বাড়িয়ে দিলো জুনেস্কির দিকে। 'পড়ে দেখো।'

রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেললো জুনেস্কি চিঠিটা। মুখ তুলে দেখলো সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বস, গভীরভাবে চিন্তান্বিত। বুঝলো, যা ঘটেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে সব খাপে খাপে মিলিয়ে নিচ্ছে সে।

আপন মনে মাথা নাড়লো পপকিন। 'ব্রেন একটা...' আবার বললো সে। তাকালো জুনেস্কির দিকে।

কার বুদ্ধির প্রশংসা করা হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না জুনেস্কির। বসের বস্ সম্পর্কে এই প্রশংসাবাণী। একটা হাঁফ ছেড়ে চেয়ারে নড়ে চড়ে বসলো সে। বললো, 'যাক, বাঁচা গেলো। সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'রানা কোথায়?' জানতে চাইলো পপকিন।

'ঘুমাচ্ছে।'

'মেয়েটা?'

'সে-ও ঘুমাচ্ছে, নিজের কামরায়।'

'হাতের কাজ সেরে আধঘণ্টার মধ্যে রওনা হচ্ছি আমরা,'

বললো পপকিন। 'রানাকে ব্যাখ্যা দিতে এখন আর কোনো অসুবিধে নেই। জুলি হোটেলেই যোগ দেবে আমাদের সাথে।'

'কতটা বলবেন রানাকে, স্যার ?'

'যতটুকু না বলে পারা যায়,' বললো পপকিন। গম্ভীর।

দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো রানার। উঠে বসে চোখ কচলাচ্ছে। জুলি নাকি ? বিছানা থেকে নেমে বাথরোবটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এগোলো দরজার দিকে।

দরজা খুলে পপকিনকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো রানা। হাসি হাসি মুখ।

'ঘুম ভাঙাবার জন্যে দুঃখিত,' মুখের হাসিতে দুঃখের ছিটে-ফোঁটাও নেই পপকিনের। 'কিন্তু তোমাকে আর অন্ধকারে রাখতে চাই না…'

ঘুম জড়ানো চোখ দু'টো পিট পিট করছে রানার। 'কাম ইন,' বলে ঘুরে দাঁড়ালো ও, সোজা হেঁটে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

পপকিন, তার পেছনে জুনেস্কি, এবং সবশেষে কামরায় ঢুকলো জুলি। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো রানা। জুলি এবং জুনেস্কিকে দেখে একটু অবাক হলো। কিন্তু কিছু বললো না।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পপকিন। পর্দা সরিয়ে রোদ ঢোকার পথ করে দিয়ে রানার দিকে ফিরলো সে। এগিয়ে এসে টেবিলে একটা এনভেলাপ রাখলো। 'মেয়েটা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য,' বললো সে। 'তোমার অসুবিধে দূর করার জন্যে কয়েকজন লোক অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, শীঘ্রিই ওর সম্পর্কে আরো তথ্য আশা

করছি আমি।'

'অসুবিধে আমার নয়, আপনাদের,' বললো রানা। তোয়ালেটা একটা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখলো। তাকালো পপকিনের দিকে। 'নিন, শুরু করুন। গোটা ব্যাপারটার ব্যাখ্যা চাই আমি।'

একটা চেয়ারের দিকে আঙ্গুল তুললো পপকিন। 'আরাম করে বসো, রানা,' বললো সে। বসলো দ্বিতীয় চেয়ারটায়। 'অনেক কথা, বলতে সময় লাগবে।' চুরুট ধরাচ্ছে।

বিছানার কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসলো জুলি। কামরায় ঢোকার পর থেকে একটাও কথা বলেনি সে। কয়েকবার তার দিকে তাকিয়েছে রানা, কিন্তু মুখের ভাব দেখে নির্বিকারই মনে হয়েছে তাকে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। হাসি নেই মুখে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কেমন একটা সতর্ক ভাব।

এক গাল ধোঁয়া ছাড়লো পপকিন। সামনে বসা রানার চোখে চোখ রাখলো। 'ঠিক কি জানতে চাও তুমি, রানা? তুমি বরং প্রশ্ন করো, আমি উত্তর দিয়ে···

'কে আমি?' পপকিনকে থামিয়ে দিয়ে প্রায় উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো রানা।

'তুমি আমাদের লোক। একজন ইহুদি। বর্তমানে ইসরায়েলের নাগরিক···'

আবার বাধা দিলো পপকিনকে রানা। অধৈর্য কণ্ঠে বললো, 'ফালতু প্যাচাল। আমি ইহুদি, ইসরায়েলের নাগরিক—এসবই তো আমার জানা আছে। আমি জানতে চাই—কে আমি? আমার পেশা কি? কেন আমার চেহারা বদল করা হয়েছে? স্মৃতি কেড়ে নেয়া হয়েছে আমার—কেন? তোমাদের আসল উদ্দেশ্য কি? এবং

শেষ পর্যন্ত কি হতে যাচ্ছে আমার অবস্থা?'

জুনেস্কির দিকে চট্ করে একবার তাকালো পপকিন। সকলের অলক্ষ্যে কি যেন একটা ভাবের বিনিময় ঘটে গেলো দু'জনের মধ্যে।

'তুমি একজন স্পাই, রানা' রানার চোখে চোখ রেখে বললো পপকিন। 'জিওনিষ্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশন্যালের একজন দুর্ধর্ষ এজেন্ট।' মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটে। 'আমাদের গর্ব। দেশের কৃতি সন্তান।'

জুনেস্কির ঠোঁটে এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেলো।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখটা জুলির। রানার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে হঠাৎ যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে, উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মুখের চেহারা।

কোনো প্রতিক্রিয়া নেই রানার চেহারায়। 'থামলেন কেন, বলে যান।'

'তোমার মা বাবা মারা গেছেন। ভাই বোন ছিলই না। আত্মীয়-স্বজনও নেই।'

'সুতরাং তাদের সম্পর্কে আমার কোনো কৌতূহলও নেই,' নীরস গলায় বললো রানা। 'আমার স্মৃতি কেন কেড়ে নেয়া হয়েছে?'

'সে দীর্ঘ এক কাহিনী। সংক্ষেপে বলছি'। চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না দেখে নিরাশ হলো পপকিন। টেবিলে রেখে দিলো চুরুটটা। মুখ তুলেলো। 'গোটা ব্যাপারটাই একটা ভুলের পরিণতি। আমাদেরই একটা শাখা প্রতিষ্ঠান তাদের বিশেষ একটা অ্যাসাইন-মেন্টের স্বার্থে তোমাকে ধার নিয়েছিলো। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাহায্যে তোমাকে ওরা কিছু পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন দেবার

ব্যবস্থা করে। সেই সাইকিয়াট্রিস্ট কাজটা করতে গিয়ে মারাত্মক একটা ভুল করে বসে, যার ফলে তুমি তোমার প্রায় সবটুকু অতীত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছো।' কিছু বলতে যাচ্ছে রানা, তাই দেখে হাত তুলে তাকে বাধা দিলো পপকিন। 'তার এই ভুলের জন্যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, রানা। তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

রানার মুখের ভাবে এখনও কোনো পরিবর্তন নেই। পপকিনের ব্যাখ্যা বিশ্বাস করছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জুনেস্কির ভুরু কুঁচকে উঠেছে। একটা অস্বস্তি অনুভব করছে সে।

'হুঁ,' অনেকটা ব্যঙ্গের সুরে বললো রানা। 'আর চেহারা বদলের ব্যাখ্যাটা?'

'এর মধ্যে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে হঠাৎ তোমাকে আমাদের নিজেদেরই দরকার হয়ে পড়লো,' বললো পপ-কিন। 'খুব জরুরী একটা অ্যাসাইনমেন্ট, হাতে সময় খুব কম। ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে একটা মিশনে যাবার কথা আমার। হঠাৎ জানা গেলো, ডক্টরের পেছনে ফেউ লেগেছে, তাকে কিডন্যাপ করার ষড়যন্ত্র চলছে। হেডকোয়ার্টারকে জানালাম ব্যাপারটা। তারা আমাকে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে বললো। এবং, তাড়াহুড়োর মধ্যে চেহারা বদলে তেলআবিব থেকে পাঠিয়ে দিলো তোমাকে। এবং ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে চলে গেল নিরাপদ আশ্রয়ে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ডক্টর ফিলাতভের ওপর থেকে শত্রুদের নজর তোমার ওপর সরিয়ে আনা। তুমি একজন দুর্ধর্ষ স্পাই, ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার যোগ্যতা শুধু তোমারই আছে। সেজন্যেই বেছে নেয়া হয়েছে তোমাকে।' একটু বিরতি নিয়ে গলার স্বরে আন্তরিকতা

ফোটাবার চেষ্টা করলো পপকিন। ‘কিন্তু তাই বলে ভেবো না যে তোমার স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপারটাকে অবহেলা করা হচ্ছে। এই অ্যাসাইনমেণ্টটা শেষ হয়ে গেলেই দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা সাইকিয়াট্রিস্টের সাহায্যে চিকিৎসা করা হবে তোমার। আবার সব কথা মনে করতে পারবে তুমি। শুধু তাই নয়, প্লাস্টিক সার্জারীরও ব্যবস্থা করা হবে, যাতে আবার আগের চেহারা, আসল চেহারা ফিরে পাও। সব পরিষ্কার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে?’

এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে রানা। ‘এসব কিছুই আমি বিশ্বাস করছি না,’ বললো ও। ‘কিম্বা অবিশ্বাসও করছি না। আপনি যা বলছেন, শুনে যাচ্ছি শুধু। সত্যি না মিথ্যা প্রমাণ বা যাচাই করার কোনো উপায় নেই এই মুহূর্তে আমার বা আপনার। প্রথমে আমাকে রানা বলে মানতেই চাননি। এখন আবার নিজেরাই স্বীকার করছেন আমি মাসুদ রানা। যারা এতো ঘন ঘন মত পাল্টায় তাদের কথার দাম দেয়া যায় না। ভালো কথা, এতো নাটক না করে এসব কথা আমাকে আরো আগেই জানানো হয়নি কেন?’

‘আমরা নিজেরাই জানতাম না,’ বললো পপকিন। চিকণ ঘাম দেখা দিয়েছে তার কপালে। রানার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তাকে অত্যন্ত সাবধানে, চিন্তাভাবনা করে দিতে হচ্ছে। ‘তেলআবিব থেকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লেখা হয়েছিলো, কিন্তু সেটা আমরা দেরিতে পেয়েছি।’

পায়ের উপর পা তুলে দিলো রানা। আগের মতোই গম্ভীর। ‘ইন্টারেস্টিং, সন্দেহ নেই। শুনতে ভালই লাগছে। আরো কিছু শোনান তাহলে। ‘আমার চেহারা বদলে দিয়ে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশন্যাল দেশের কি উপকারটি করতে চাইছে?’

থমথম করছে জুনেস্কির মুখ। রানার মাথার উপর দিয়ে পপকিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বসের সাথে পলকের জন্যে আরেকবার চোখাচোখি হলো তার।

হাসি হাসি মুখ করলো পপকিন। 'আমার কথা বোধহয় মনোযোগ দিয়ে শুনছো না তুমি, রানা। আগেই তো বললাম, ডক্টর ফিলাতভের ওপর থেকে শত্রুদের দৃষ্টি সরাবার উদ্দেশ্যেই তোমার চেহারা বদল করা হয়েছে। বেশ, আরেকটু ব্যাখ্যা করছি। শত্রুদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে তোমার কাঁধে। তোমার সাথে আরো লোকজন থাকবে, শত্রুরা মনে করবে ওরা ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তা প্রহরী। নাকের সামনে মুলো দেখে ছুটবে গাধারা, অনেক দূরে চলে যাবে, এই ফাঁকে আমি আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে অ্যাসাইনমেন্টে রওনা হবো।'

'এইটুকুতে আমি সন্তুষ্ট নই,' দৃঢ় স্বরে বললো রানা। 'আগেই বলেছি, আপনাদেরকে আমি বিশ্বাস করি না। দেশের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি আছি, কিন্তু তার আগে জানতে চাই যারা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে তারা দেশের উপকার করতে চাইছে, না অপকার?'

'ব্যাপারটা তুমি বুঝছো না, রানা.' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছার ফাঁকে আবার জুনেস্কির দিকে তাকালো পপকিন।

একটা অস্থিরতা অনুভব করছে জুনেস্কি। বসের সার্ভাসনেসটা উপলব্ধি করছে সে। প্যাঁচে আটকে ফেলেছে ওদেরকে রানা।

'বোঝার আমার আছেই বা কি?' রুক্ষ স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা। 'যা কিছু বলছেন, সত্য কি মিথ্যা, প্রমাণ করতে পারবেন? ভালো কথা, হেডকোয়ার্টার থেকে যে চিঠিটা এসেছে বলছেন, কই

সেটা, দেখি ?'

পপকিন গম্ভীর। 'নিয়ম হলো পড়ে দেখার পরপরই সব চিঠি পুড়িয়ে ফেলতে হয়।'

'সেক্ষেত্রে,' বললো রানা, 'পুরো কাহিনীটা শুনতে চাই আমি। সবটা শুনবো, বিবেচনা করবো, সন্তুষ্ট হবো, তারপর জানাবো নিজের মতামত।'

পপকিন চুপ করে আছে। একটা উদ্বেগ ফুটে উঠেছে জুলির চেহারায়। জুনেস্কির মুখে ক্রোধের আভাস, কিন্তু চুপচাপ।

কারো মুখে কথা নেই অনেকক্ষণ কাটলো। নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানাই। হুমকির মতো শোনালো ওর কথাগুলো, 'শুধু তাই নয়, ডক্টর ফিলাতভের পূর্ণাঙ্গ ডোশিয়ার চাই আমি।'

দশ সেকেণ্ড কাটলো আরো। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকালো পপকিন। গম্ভীরভাবে বললো, 'বেশ।' কি যেন ভাবলো সে। তারপর মুখ তুলে তাকালো জুলির দিকে। 'তার আগে একটা ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পেতে চাই আমি।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'প্রথম দিন এখানকার হোটেলে ঘুম ভাঙার খানিকপর তুমি নিচে নেমে গ্যারেজে যাও, তাই না ? গাড়িতে একটা পুতুল ও একটা চিরকূট পেয়েছিলে, সে দু'টো দেখাতে পারো আমাকে ?'

একটা ড্রয়ার খুলে পুতুল আর চিরকূটটা বের করলো রানা। পপকিনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। বিড় বিড় করে চিরকূটের লেখাটা পড়লো সে।

'তোমার ড্রামেন ডলি তোমার জন্যে স্পাইরালটোপেনে অপেক্ষা করছে। ১০ই জুলাইয়ের ভোরবেলা।' চিরকূটটা নাকের কাছে তুলে শ্বাস টেনে শুঁকলো। 'বাহ্, সুগন্ধ মাখা।'

এই প্রথম কথা বললো জুলি, 'পুতুলটার কথা জানি, কিন্তু সাথে একটা নোট ছিল এই প্রথম জানলাম আমি।'

'এটা পেয়েই তো স্পাইরালটোপেনের মাথায় গিয়েছিলো রানা,' বললো জুনেস্কি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানা জুনেস্কির দিকে। সম্বোধনের পরিবর্তনটা কানে বেজেছে ওর। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকলো দীর্ঘ পাঁচ সেকেণ্ড। রানার চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সহ্য করতে পারলো না জুনেস্কি, চোখের পাতা নড়ে গেলো তার। হাসতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু ক'টা দাঁত বেরোলো শুধু, হাসিটা ফুটলো না।

জুলির কথা কানে ঢুকছে, সচেতন হয়ে ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে নিলো রানা।

'চিরকুটটা দেখতে পারি?' বললো জুলি। পপকিনের বাড়ানো হাত থেকে নিলো সেটা। পড়লো। ভুরু কুঁচকে উঠছে তার, 'হতে পারে…

'কি ব্যাপার জুলি?' দ্রুত জানতে চাইলো পপকিন।

ইতস্তত করছে জুলি। বললো, 'গত হপ্তায় ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে স্পাইরালটোপেনে গিয়েছিলাম আমি। রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেয়েছিলাম আমরা।' আবার একটু ইতস্তত করলো সে। 'বাথরুমে যেতে হয়েছিলো আমাকে, ফিরে এসে দেখি ডক্টর ফিলাতভ একটা মেয়ের কোমরে হাত রেখে কথা বলছেন। দু'জনে খুব হাসাহাসি চলছিলো। আমাকে দেখেই চুপ করে গেলো ওরা। তাড়াতাড়ি কেটে পড়লো মেয়েটা।'

'ব্যস এইটুকু?' জানতে চাইলো পপকিন।

'জী,' বললো জুলি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জুলিকে দেখছে পপকিন। 'জুলি,' গম্ভীর গলায় বললো পপকিন। 'আমার মনে হচ্ছে কি যেন তুমি লুকাচ্ছো।'

মুখটা লালচে হয়ে উঠলো জুলির। আবার একটু ইতস্তত করলো সে। তারপর বললো, 'স্যার...ডক্টর ফিলাতভ, মানে...এই ক'দিনে ভদ্রলোককে যতটুকু আমি চিনেছি, তিনি সাংঘাতিক মেয়ে-ঘেঁষা স্বভাবের লোক। রাস্তা ঘাটে মেয়ে দেখলে তার হুঁশ থাকে না।'

'হুঁ,' বললো পপকিন। 'তুমি বলতে চাইছো স্পাইরালটোপে-নের ওই মেয়েটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে শত্রুপক্ষ, তারা জানতো ডলি অর্থাৎ মেয়েটার কথা উল্লেখ করে চিরকুট রেখে গেলেই ডক্টর ফিলাতভ অমনি ছুটবে?'

'জী।'

'হুঁ,' বললো পপকিন। ফিরলো রানার দিকে। 'আচ্ছা, বলো তো, ওখানে যারা আক্রমণ করেছিলো তারা কি তোমাকে স্রেফ ধরতে চেয়েছিলো, নাকি খুন করতে চেয়েছিলো?'

'ওদেরকে জিজ্ঞেস করার জন্যে দাঁড়াইনি আমি,' ভাবলেশহীন মুখে বললো রানা। 'তবে, বুঝতে পারি আমাকে খুন করা হয়তো ওদের উদ্দেশ্য ছিলো না।'

'হুঁ,' টেবিল থেকে নিভে যাওয়া চুরুটটা তুলে নিয়ে তাতে অগ্নি-সংযোগ করলো পপকিন। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে তাকালো রানার দিকে। 'এর মধ্যে হোটেলেও কয়েকবার চেষ্টা করেছে ওরা তোমার কাছাকাছি পৌঁছুতে, কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছো, ওদের উদ্দেশ্য ডক্টর ফিলাতভকে অর্থাৎ তোমাকে খুন করা নয়। তোমাকে ওরা কিডন্যাপ করতে চায়।'

'কেননা, ডক্টর ফিলাতভ এমন কিছু জানে বা তার কাছে এমন কিছু আছে যা অত্যন্ত মূল্যবান,' বললো রানা। 'কি সেটা, মিঃ পপকিন?'

'ঠিক আছে, জুলি,' বললো পপকিন। 'তুমি এবার যেতে পারো।'

রানার দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো জুলি। একটু হাসলো, কিন্তু জুনেস্কি ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দ্রুত মুছে ফেললো মুখ থেকে হাসিটা। নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে গেলো কামরা থেকে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো আবার জুনেস্কি।

জ্বলন্ত চুরুটের দিকে তাকিয়ে আছে পপকিন। রানা তার মুখের ভাব লক্ষ্য করছে।

'আমার নীতি হলো, রানা,' চোখ না তুলেই কথা বলছে পপ-কিন। 'যার যতটুকু জানা প্রয়োজন তাকে ততটুকু জানানো, তার বেশি নয়। জুলিকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি কিন্তু সব কথা জানার ওর কোনো প্রয়োজন নেই, তাই ওকে জানাচ্ছি না। আমি মনে করি, সব কথা তোমারও জানার প্রয়োজন নেই।'

'আমি মনে করি, আছে,' শান্তভাবে জানিয়ে দিলো রানা।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো পপকিন। তারপর মুখ তুললো। দ্রুত কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানার অগোচরে পপকিনকে জানিয়ে দিলো জুনেস্কি উপায় নেই, রানা ওদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছে।

তবু শেষ চেষ্টা করলো পপকিন। 'ভালো করে ভেবে দেখো রানা। দেশের স্বার্থ বিবেচনা করো। যতো বেশি জানবে তুমি, বিপদের ঝুঁকি ততো বেশি। শত্রুদের হাতে ধরা পড়ার ভয় রয়েছে

তোমার, ওরা টরচার করে সব কথা তোমার মুখ থেকে বের করে নিতে পারে। তা যদি পারে, মস্ত ক্ষতি হবে দেশের। দেশের ক্ষতি হোক, চাও তুমি?'

'চাই না,' বললো রানা। 'চাই না বলেই সব কথা জানা দরকার আমার। কে আমার বস্ আমি জানি না। আমার স্মৃতি যদি অটুট থাকতো আমার বস যদি সরাসরি আমাকে নির্দেশ দিতো —কোনো প্রশ্ন না করে পালন করতাম সেই নির্দেশ। কিন্তু বর্তমান ঘটনা তা নয়। আপনাদের ওপর আমার কোনো আস্থা নেই। সবটুকু শুনবো আমি। তারপর সিদ্ধান্ত নেবো।'

রানার চোখে চোখ রেখে দশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো পপকিন। কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিলো শেষ মুহূর্তে। কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর কোনো ভূমিকা না করেই শুরু করলো, 'শোনো। ডক্টর আনাতোলি পপোভিচ ফিলাতভ একজন ফিন। মানে, ওর জন্ম ফিনল্যাণ্ডে।'

'ফিন? কিন্তু ওর নামটা তো ফিন নয়?' বললো রানা।

'হ্যাঁ,' বললো পপকিন। 'ওর নামটা ঠিক ফিনিশ নয়। ও একজন ক্যারোলিয়ান ফিন, জায়গাটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত রাশিয়ান বর্ডারের এপাশে ছিলো। জন্মের পর ফিলাতভ যদি সেখানেই থেকে যেতো, আজ তাহলে সোভিয়েত রাশিয়ার নামজাদা এক বৈজ্ঞানিক হতো সে। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। বলছি।'

আবার চুরুটটা ধরিয়ে নিলো পপকিন।

শরীরের ভার এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপালো জুনেস্কি।

'১৯৩৯ সালে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে,' শুরু করলো পপকিন। 'উইন্টার ওয়র হিসেবে এই যুদ্ধটা বিখ্যাত। ফিনরা এ

যুদ্ধে রাশিয়ানদেরকে তেমন সুবিধে করতে দেয়নি। এরপর ৯৪১ সালে জার্মানী আক্রমণ করে রাশিয়াকে। ফিনরা ভাবে, প্রতিশোধ নেবার এটাই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু তারা ভুল করেছিলো, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে লাভ হয়নি কিছু, বরং লোকসান দিতে হয়েছিলো।'

'ফিনদের কাছে এই যুদ্ধটা কন্টিনিউয়েশন ওয়র হিসেবে পরিচিত। যুদ্ধের শেষে দু'পক্ষের মধ্যে একটা শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশের মাঝখানের সীমান্ত রেখা বাতিল করা হয়। আগের সীমান্তটা লেনিনগ্রাডের খুবই কাছে, রাশিয়ানদের সেটাই ছিলো উদ্বেগের কারণ। ফিনল্যাণ্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে একজন গানার কামানের গোলা ছুঁড়ে লেনিনগ্রাডের মাঝখানটা অনায়াসে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে পারতো। তাই রাশিয়ানরা চুক্তির মাধ্যমে গোটা Karelian Isthmus এবং আরো কিছু ছোটখাটো ভূখণ্ড নিজেদের এলাকায় ঢুকিয়ে নিলো। এই এলাকার মধ্যেই ছিলো ফিলাতভের জন্মস্থান, এনসো। রাশিয়ানরা এনসোর নতুন নামকরণ করেছে স্ভেটোগোরস্ক (Svetogorsk)।'

ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে আগুনটাকে গনগনে করে তুললো পপকিন। ধোঁয়ার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে তাকালো রানার দিকে। 'সহজবোধ্য করে বলতে পারছি তো, রানা?'

'বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না,' বললো রানা। 'কিন্তু নতুন করে ইতিহাসের পাঠ নিতে আমার কোন আগ্রহ নেই। আসল ব্যাপারটা জানতে চাই আমি।'

'সেদিকেই এগোচ্ছি,' কণ্ঠস্বর থেকে তিক্ততার ভাব দূর করতে চাইলেও পারলো না পপকিন। একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু

করলো সে, 'যুদ্ধ যখন শেষ হলো ফিলাতভ তখন মাত্র যৌবনে পা দিয়েছে। ফিনল্যাণ্ডের অবস্থা তখন শোচনীয়। নতুন সীমান্ত রেখা টপকে প্রায় সব ফিন মূল ভূখণ্ডে চলে আসছে, কারণ তারা রাশিয়ানদের সাথে থাকতে চায় না! ফিনল্যাণ্ডের সে এক করুণ অবস্থা। সে তার নিজের নাগরিকদেরকেই জায়গা দিতে পারছে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে তারা সুইডেনকে অনুরোধ করলো এক লক্ষ ফিনকে রিফিউজি হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে। সুইডিশরা মহৎ হৃদয়, তারা এক কথায় রাজি হয়ে গেলো।'

রানা কিছু বলবে আশা করে অপেক্ষা করছে পপকিন। কিন্তু মুখ খুললো না রানা। অনড় বসে আছে। চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না ওর।

'এই এক লক্ষের সাথে সুইডেনে এলো ফিলাতভও। অল্প কিছুদিন ওখানে থাকার পর সে চলে এলো এখানে, এই অসলোয়। চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত এখানেই ছিলো। তারপর গেলো ইসরায়েলে। এই পুরো সময়টা একাই ছিলো সে, যুদ্ধের সময় তার বাবা-মা মারা গিয়েছিলো। কিন্তু ইসরায়েলে পৌঁছেই সে বিয়ে করলো। মেয়েটার টাকা ছিলো, তাকে বিয়ে করার সেটাই ফিলাতভের বড় কারণ।'

ধীরে ধীরে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠছে রানার চেহারায়।

'ফিলাতভকে মেধাবী বললে কম বলা হবে, সে একটা প্রতিভা,' আবার শুরু করলো পপকিন। 'ইলেকট্রোনিকসে তার দখল সাংঘাতিক। এই বিষয়ে অসংখ্য আবিষ্কার আছে তার। শুধু তাই নয়, নিজের আবিষ্কারগুলোকে নগদ টাকায় রূপান্তর করার ব্যাপারেও চমৎকার কৌশলী সে। ব্যবসা শুরু করার জন্যে প্রথম স্ত্রীর টাকা

টাকে কাজে লাগালো সে। কিছুকাল পর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলো ওদের। এর মধ্যে স্ত্রীকে কয়েক লক্ষ ডলার লাভ দিয়েছে ফিলাতভ। নিজেও কয়েক লক্ষ ডলার বানিয়ে নিয়েছে, আরো বানাচ্ছে।'

লাইটার জ্বাললো পপকিন। চুরুট ধরাবার আগে জুনেস্কির দিকে তাকালো। 'এক গ্লাস পানি।'

'এর মধ্যে প্রতিভাবান ফিলাতভ একজন কেউকেটা হয়ে উঠেছে' কথার সাথে সাথে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে পপকিনের মুখ থেকে। 'কয়েকটা ফ্যাক্টরীর মালিক সে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সাথে চুক্তিতে যুদ্ধাস্ত্রের খুচরো অংশ তৈরি করছে। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও—অ্যাঙলো ফ্রেঞ্চ জাগুয়ার ফাইটার থেকে শুরু করে কনকর্ড পর্যন্ত অসংখ্য বিমানে তার ইলেকট্রোনিকস যন্ত্রপাতির সমাবেশ ঘটেছে। ব্যাটল ট্যাঙ্কগুলোকে অত্যাধুনিক করার পেছনেও তার ফ্যাক্টরীর অবদান রয়েছে। ইসরায়েলের প্রধান মন্ত্রী তাকে ডেকে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, এমন একটা ট্যাঙ্ক তৈরি করো যেটা নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, চিন্তা করতে পারে, ভুল সংশোধন করতে পারে। তৈরির কাজ চালু হয়ে গেছে, নাম রাখা হয়েছে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। বুঝতেই পারছো, ফিলাতভ এখন উঁচু স্তরের গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার কথা কিছুই জানে না।'

'দু'হপ্তা আগে হলে আমিও জানতে চাইতাম না।' বিরক্ত হয়ে বললো রানা।

গুরুর সাথে চেলার আবার চোখাচোখি হলো। পানির গ্লাসটা ডেস্কে রেখে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো জুনেস্কি।

পপকিন বললো, ফিলাতভ মাথাটা পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে

তার বাবার কাছ থেকে, সুতরাং সেই বুড়োর ওপর কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে…'

'তার কি কোনো দরকার আছে?'

'নেই,' বললো পপকিন, 'যদি সবটা না শুনলেও চলে তোমার।'

'সংক্ষেপে বলে যান,' রিস্টওয়াচে চোখ রেখে বললো রানা।

'নিকোলাই ফিলাতভ ছিলেন দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী একজন ফিজিসিস্ট। লোকে বলে, যুদ্ধের সময় তিনি মারা না গেলে নোবেল প্রাইজের তালিকার শীর্ষে তাঁর নাম থাকতো। যুদ্ধের জন্যে তাঁর গবেষণা বিঘ্নিত হয়, তিনি ফিনিশ সরকারের পক্ষে কাজ করার জন্যে ভাইপুরীতে চলে যান। ভাইপুরী ফিনল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিলো। কিন্তু সেটা ক্যারেলিয়া এলাকায়, এবং এখন রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ানরা শহরের নতুন নামকরণ করেছে—ভাইবোর্গ।'

মুখভাবে বিরক্তি ফুটে থাকলেও প্রতিটি কথা মনে গেঁথে নিচ্ছে রানা, মনে মনে কয়েকবার করে উচ্চারণ করে নিচ্ছে, বিশেষ করে নামগুলো যাতে ভুলে না যায়।

'যুদ্ধের সময় ভাইপুরী প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই সাথে নিকোলাই ফিলাতভের ল্যাবরেটরীটাও। ওখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে এনসোর নিজের বাড়িতে চলে যান তিনি। এর মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাশিয়ানদেরকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। যুদ্ধের আগে প্রচুর 'গবেষণার কাজ করেছিলেন তিনি, সেগুলো কোথাও প্রকাশিত হয়নি তখনো। কাগজপত্রগুলোর নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। একটা মেটাল ট্রাঙ্কে তাঁর সব কাগজপত্র ভরে সীল করে দিলেন, পুঁতে রাখলেন বাড়ির বাগানে।

আমাদের ফিলাতভ তাঁকে সাহায্য করলো। পরদিন…' চুরুট ধরাবার জন্যে থামলো পপকিন।

নিজের অজান্তেই প্রশ্ন বেরিয়ে গেলো রানার মুখ থেকে। 'পরদিন? কি হলো পরদিন?'

'একটা বোমা। পরদিন একটা বোমা।' নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে নিয়ে আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়লো পপকিন। নিকোলাই ফিলাতভ, তার স্ত্রী, ছোটো ছেলে—মারা পড়লো তিনজন। ফিলাতভও মারা যেতো, কপাল জোরে বেঁচে গেছে, বাড়িতে ছিলো না তখন।'

'কাগজগুলো রক্ষা পেলো,' কোনরকম শোক প্রকাশ করলো না রানা, বললো, 'কি ধরনের গুরুত্ব ওগুলোর?'

গভীর ভাবে ভাবছে পপকিন আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি রানাকে সব কথা না বলে পারা যায় কিনা? উঁহু, ত্যাঁদোড় ছোকরা, কোনভাবেই এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে, অথচ স্বভাবের দৃঢ়তা লোহার মতো কঠিন। কোথায় ঠেকে আছে তারা ঠিকই বুঝে নিয়েছে, চাপ দিয়ে সব কথা আদায় করে নিচ্ছে—এখনো এরকম, না জানি এর আসল মূর্তি কতটা ভয়ঙ্কর। মনে মনে হাসলো সে। যতোই ভয়ঙ্কর হও হে, যমের বাড়িতে দিচ্ছি তোমাকে পাঠিয়ে, টেরও পাবে না বাছাধন…

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি,' গ্লাসটা তুলে নিয়ে কলজেটা ঠাণ্ডা করলো পপকিন। গত বছরের কথা। আমাদের ফিলাতভ তখন সুইডেনে। হঠাৎ এক মহিলার সাথে দেখা। ফিনল্যাণ্ড থেকে একা চলে আসার পর এই মহিলাই ক'দিনের জন্যে আশ্রয় দিয়েছিলো ফিলাতভকে। ভারি সৎ মহিলা। ফিলাতভকে দেখেই বললো, তুমি বাবা আমার বাড়িতে একটা বাক্স ফেলে রেখে গেছো, চলো আমার

সাথে নিয়ে আসবে সেটা।

'হোটেলে ফিরে এসে বাক্সটা খুললো ফিলাতভ। কিশোর একটা ছেলের শখের জিনিসে ভর্তি বাক্সটা। একটা রেডিওর ডিজাইন পেলো ফিলাতভ, তার নিজের করা। সেই বয়সেই ইলেকট্রোনিকস ওকে আকৃষ্ট করেছিলো। আরো কিছু ডিজাইন বেরুলো। তার মধ্যে একটা রেডিও-কনট্রোলড মডেল। এয়ারক্র্যাফটের। এবং একটা পুরানো রেডিও ম্যাগাজিনের ভিতর পাওয়া গেলো একটুকরো কাগজ, তাতে তার বাবার হাতের কিছু লেখা। এই জিনিসটা পাওয়াতেই ওর বাবার সেই মাটিতে পুঁতে রাখা গবেষণা সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো হঠাৎ সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো।'

রিস্টওয়াচের দিকে চোখ রেখে বললো রানা, গবেষণার বিষয় কি ছিল ভদ্রলোকের?'

শুনেও না শোনার ভান করলো পপকিন। বললো, প্রথমে ফিলাতভ বুঝতেই পারেনি কি সাংঘাতিক জিনিস পড়েছে তার হাতে। সুইডেনের কয়েকজন বিজ্ঞানীর সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলে সে। হঠাৎ তার বোধের উদয় হয়, এবং কালবিলম্ব না করে সোজা চলে যায় তেল আবিবে, সেখানে উপযুক্ত লোকদেরকে ব্যাপারটা জানায়। এই উপযুক্ত লোকেরাই, বুঝতেই পারছো, তোমার আমার মনিব। তাদের নির্দেশেই এর মধ্যে এসেছি আমি। তুমিও।'

'কাজটা হলো বাগানের মাটি খোঁড়া,' বললো রানা। 'তাই না?' গলার স্বরে একটু তাচ্ছিল্যের রেশ।

'হ্যাঁ। তা ঠিক। মাটি খোঁড়াই বটে। তবে,' তিক্ত হাসলো পপকিন। 'বাগানটা রাশিয়ায়, এই যা।' চুরুটের আগুনের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকলো সে। 'তুমি সন্তুষ্ট, রানা?'

'এইটুকুতে?' মৃদু হাসলো রানা। 'না।'

'আর কি জানতে বাকি আছে তোমার?' রাগ চেপে রাখতে গিয়ে গলাটা বেসুরো করে ফেললো পপকিন।

'আসল কথাটাই এখনো জানি না,' বললো রানা। 'কাগজগুলোর গুরুত্ব কতটা? নিকোলাই ফিলাতভের গবেষণার বিষয়বস্তু কি ছিলো? এবং আমার দেশ ওগুলো উদ্ধার করতে চাইছে কেন? কি কাজে লাগবে ওগুলো আমাদের?'

কথা সরলো না পপকিনের মুখে। রানার দিকে তাকিয়ে আছে

'আরো প্রশ্ন আছে আমার,' বললো রানা। 'সেগুলো আসবে পরে।'

হিম গলায় বললো পপকিন, 'না এখনই বলো আর কি প্রশ্ন আছে তোমার।'

'বেশ,' নড়েচড়ে বসলো রানা। 'আপনি আমার ওপর যতোই অসন্তুষ্ট হন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতে হবে। এমন একটা কাজের দায়িত্ব আমি নেবো না যে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, বা যে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আনাড়ীর মতো মারা পড়বো। আপনিই জানিয়েছেন, আমি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট। আপনার এই কথাটা আমি বিশ্বাস করি। তার মানে আমার গুরুত্ব আছে, দেশ আমার কাছ থেকে সেবা চায়। আমার উপযুক্ত নয় এমন একটা কাজ করতে গিয়ে যদি মারা যাই, দেশের ক্ষতি হবে। একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে সেটা আমি সজ্ঞানে ঘটতে দিতে পারি না। পারি না বলেই আমি জানতে চাই ভাইভারশনে কোথায় আমাকে পাঠানো হবে।'

'আগেই বলেছি, ফিনল্যাণ্ডে।'

'কিন্তু ফিলাতভ ফিন ভাষা জানতো, আমি জানি না। এটা একটা বাধা নয়?'

'না। প্রায় দুই যুগ ধরে ফিনল্যাণ্ডে অনুপস্থিত ফিলাতভ, ভাষাটা সে ভুলে গেছে। অনেক দিন সম্পর্ক না থাকলে বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে যায় লোকে।'

'বেশ। না হয় ভুলেই গেছি। এবার ঝুঁকির প্রসঙ্গে আসা যাক।'

'ঝুঁকি?' ভুরু কুঁচকে তাকালো পপকিন।

'ফিলাতভ হিসেবে ফিনল্যাণ্ডে যাবো। দলে দলে পিছু নেবে শত্রুপক্ষরা। তারা নিশ্চয়ই আমার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্যে···'

'হ্যাঁ, ওরা তোমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে,' বললো পপকিন। 'কিন্তু সফল হবে না। তোমার সাথে আরো লোক যাচ্ছে। তারা তোমাকে পাহারা দেবে। আর তুমি নিজেও তো কম নও, একজন দুর্ধর্ষ স্পাই।' মুচকে হাসলো পপকিন।

'তারপর? শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থা কি হবে?'

'আমার মিশন শেষ হলেই তোমাকে ডেকে পাঠানো হবে,' উৎসাহের সাথে বললো পপকিন। 'সোজা লণ্ডনে চলে যাবে তুমি। আগে থাকতেই ব্যবস্থা করা থাকবে। বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট এবং প্লাস্টিক সার্জেন তোমার চিকিৎসা করবেন। ক'দিনের মধ্যেই আবার তুমি তোমার স্মৃতি এবং চেহারা ফিরে পাবে। সোজা চলে যাবে তেলআবিবে, রিপোর্ট করবে তোমার বসের কাছে।' এক গাল হাসলো পপকিন। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কোনো সন্দেহ নেই, তিনি তোমার পিঠ চাপড়ে দেবেন।'

একটু হাসলো রানা। বস পিঠ চাপড়ে দেবেন বলায় একটু যেন লজ্জা পেয়েছে, সেই সাথে খুশিও হয়েছে। এর মধ্যে কোনো ঘাপলা

নেই তো ?' হালকা সুরে জানতে চাইলো রানা।

'ঘাপলা ? না না, রানা, ঘাপলা কিসের আবার ? পপকিন দ্রুত বললো, যা সত্য তাই বলছি তোমাকে। কোথাও কি অস্বাভাবিক লাগছে আমার বক্তব্য ? লাগলে বলো।'

'না, মোটামুটি স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে সব,' বললো রানা। 'শুধু একটা জিনিস বাদে। আপনি আমাকে কাগজগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে এখনো কিছু বলেননি।

'ব্যাপারটা টপ সিক্রেট, রানা। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এর সাথে।'

'এক কাজ করুন,' সহজ কণ্ঠে বললো রানা।

'কি ?' গোপন কথাটা না বলে পারা যাবে ভেবে সাগ্রহে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লো পপকিন।

'প্লেনের একটা টিকেট কেটে দিন। আমি তেলআবিবে চলে যাই।'

হাঁ হয়ে গেলো পপকিনের মুখ।

জুনেস্কির হাত দু'টো শক্ত মুঠো হয়ে গেলো।

'তেলআবিব··· ?'

'তাছাড়া উপায় কি ?' বললো রানা। কিছুই না জেনে যদি কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যেতে হয়, বসের নির্দেশেই যাবো, আপনার নির্দেশে নয়।'

তুমি ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছো···'

'না। যুক্তি সঙ্গত অনুরোধ করছি : সবটুকু জানানো হোক আমাকে।'

দেয়ালে পিঠ রেখে উশখুশ করছে জুনেস্কি। তার দিকে তাকালো

পপকিন। অহসায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে।

রানার দিকে তাকালো পপকিন। ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠলো তার মুখের চেহারা। এটা তার একটা কৃত্রিম ভাব, জেনেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো জুনেস্কির

'যা তোমাকে বলতে যাচ্ছি,' কঠিন হুমকির সুরে বললো পপকিন, 'তার একটা শব্দও যদি কখনো উচ্চারণ করো, বাকি জীবনটা তোমাকে জেলখানায় পচতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য চেষ্টা করবো তোমাকে যাতে ফায়ারিঙ স্কোয়াডে পাঠানো হয়। বুঝতে পারছো?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'এক মিনিট,' বললো ও। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে ওর। চোখ দু'টো জ্বলছে। 'আপনি কি আমার দেশপ্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ করছেন?'

ঘাবড়ে গেলো পপকিন। 'না, রানা আমার কর্তব্য তোমাকে সাবধান করে দেয়া, ব্যস। এর মধ্যে আর কোনো ব্যাপার নেই।'

চেহারা থেকে উত্তেজনা খসে পড়ছে ধীরে ধীরে রানার। চেয়ারে হেলান দিলো ও।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো পপকিন।

'নিন্ শুরু করুন এবার,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা।

গলা পরিষ্কার করে নিলো পপকিন। ধীরে ধীরে বললো, 'যদ্দূর জানা গেছে, ১৯৩৭ অথবা ১৯৩৮ সালে নিকোলাই ফিলাতভ এক্সরে-এর প্রতিফলন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।'

পপকিন আর কিছু বলছে না দেখে বিস্মিত হলো রানা 'ব্যস এইটুকু?'

'হ্যাঁ,' রুক্ষ গলায় বললো পপকিন। চেয়ার ছেড়ে উঠে

দাঁড়ালো। আড়মোড়া ভাঙছে।

'এটুকু যথেষ্ট নয়,' বললো রানা। 'এক্স-রে-এর প্রতিফলন পদ্ধতি আবিষ্কারের গুরুত্ব কি?'

'যতটা সম্ভব, জানিয়েছি এতেই সন্তুষ্ট হতে হবে তোমাকে।'

'উঁহুঁ। ব্যাখ্যা করুন। গুরুত্বটা বোঝান। তাৎপর্যটা জানতে হবে আমার।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো পপকিন। 'ঠিক আছে, জুনেস্কি, বলো ওকে।'

এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ালো জুনেস্কি। 'সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপারটার তেমন কোনো তাৎপর্য নেই, একটু বাঁকা হেসে বললো সে। 'এক্স-রে-র প্রতিফলন পদ্ধতি—সে আবার কি জিনিস? যুদ্ধের আগে এ বিষয়টা নিয়ে নিকোলাই ফিলাতভ গবেষণা করলেও, তখন এমন কি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোকদেরও এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ ছিলো না। সবাই জানতো এক্স-রে-র পেনিট্রেট করবার একটা ক্ষমতা আছে, সেটাকেই কাজে লাগানোর কথা ভেবেছে সবাই—প্রতিফলনের কথা ভাবেনি কেউ কিন্তু নিকোলাই ফিলাতভ তাঁর যুগের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। যে বিষয়ে কারো কোনো আগ্রহ ছিলো না, তাঁর ছিলো সেই বিষয়েই যতো আগ্রহ। কাজে লাগবে কিনা না জেনেই গবেষণা করেছিলেন তিনি, এবং তেমন কোনো গুরুত্ব নেই বুঝে রিসার্চের কাগজপত্র ছাপতে না দিয়ে ফাইলে বন্দী করে রেখেছিলেন।'

একটু বিরতি নিলো জুনেস্কি। তাকালো বসের দিকে। পপকিনকে চুল পরিমাণ মাথা কাত্ করতে দেখে বুঝে নিলো রানাকে সব কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাকে। হাসলো সে। 'মজার

ব্যাপারটা হলো এই যে দুনিয়ার তাবৎ ডিফেন্স ল্যাবরেটরীতে এখন রাতদিন কাজ চলছে এক্স-রে-র প্রতিফলন কিভাবে সৃষ্টি করা যায় তা আবিষ্কার করার জন্যে। কিন্তু এখন পর্যন্ত উপায়টা আবিষ্কারের ধারে কাছেও কেউ যেতে পারেনি

'এটা আবিষ্কার হলে কার কি লাভ ?'

'তার আগে জবাব দাও, লেযার কিভাবে কাজ করে জানো তুমি ?' প্রশ্নটা এলো পপকিনের তরফ থেকে।

মাথা নাড়লো রানা। 'না।'

গম্ভীর হয়ে তাকালো পপকিন জুনেস্কির দিকে।

কাঁধ ঝাঁকালো, জুনেস্কি বললো, 'তাহলে প্রথম থেকেই শুরু করি। ১৯৬০ সালে প্রথম আবিষ্কার হয় লেযার। ওটা ছিলো পিন-থেটিক রুবির একটা রড, ইঞ্চি চারেক লম্বা, ডায়ামিটার আধ ইঞ্চিরও কম, প্রতিফলন সৃষ্টির জন্যে এক প্রান্তে পুরোটা এবং অপর প্রান্তে অর্ধেকটা সিলভার করা। রডটার চারধারে প্যাঁচানো ছিলো একটা স্পাইরাল গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প, জিনিসটা ফটোগ্রাফীতে যে ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করা হয় অনেকটা সেই রকম। বুঝতে পারছেন ?'

'পরিষ্কার।'

'এই ধরনের ইলেকট্রোনিক ফ্লাশে কতটা পাওয়ার থাকে সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না,' বললো জুনেস্কি। 'পরিষ্কার করে বলছি ব্যাপারটা। সাধারণ একটা ফ্লাশের কথা ধরুন, প্রফেশন্যাল ফটোগ্রাফাররা যেটা ব্যবহার করে। কনডেনসার থেকে ডিস-চার্জ হবার মুহূর্তে এক পলকের জন্যে ৪০০০ হর্স পাওয়ার তৈরি করে ফ্ল্যাশটা। প্রথম দিকের লেযারগুলোয় যে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা

হতো সেগুলো অবশ্য এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলো—ধরুন, ২০,০০০ হর্স পাওয়ারের। ফ্ল্যাশের মাধ্যমে রুবি রডে ঢোকে আলো এবং তারপরই অদ্ভুত এক কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। সিলভারের প্রান্ত দু'টোয় প্রতিফলিত হয়ে আলোটা এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া-আসা করতে থাকে রুবি রডের ভিতর, এবং সমস্ত লাইট ফোটোন (photon) অর্থাৎ আলোক কণা একমুখী প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা এটাকে coherent লাইট বলে। সাধারণ আলো বিভিন্নমুখী বলেই অতটা শক্তি নেই ওতে। যা বলছিলাম, ফোটোনগুলো সবাই মিলে, আলোর প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা ঢেউ-য়ের মতো বেরিয়ে আসছে রডের হাফ সিলভারড্ প্রান্ত দিয়ে। ফ্ল্যাশের মাধ্যমে রডে যে পরিমাণ শক্তি ঢোকানো হয়েছিলো প্রায় সবটা অর্থাৎ প্রায় ২০,০০০ হর্স পাওয়ার এনার্জি সম্পন্ন ওই ঢেউটা বেরিয়ে আসছে একসাথে, কন্‌সেনট্রেটেড অবস্থায়।'

নিঃশব্দে হাসলো জুনেস্কি। 'এই আলোটাকে নিয়ে খুব মজা করতো সে যুগের বিজ্ঞানীরা। তারা আবিষ্কার করে, ছয় ফিট দূর থেকে এই আলোর সাহায্যে একটা রেজর ব্লেডকে ফুটো করে দেয়া যায়। জিলেট ব্লেডের হিসেবে লেযারের শক্তি পরিমাপের পরামর্শ দিয়েছিলো ওরা।'

'ফালতু কথায় সময় নষ্ট করো না,' বিরক্তির সাথে বললো পপ-কিন।

'সামরিক প্রয়োজনে লেযারকে ব্যবহার করা যেতে পারে তা সহজেই বুঝে নিলো সবাই,' বললো জুনেস্কি। 'উদাহরণ হিসেবে ধরুন, আপনি একটা লেযারকে রেঞ্জ ফাইণ্ডারের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। একটা টার্গেট লক্ষ্য করে ছুঁড়ুন এটাকে, ধাক্কা খেয়ে

ফিরে আসার সময়টা হিসেব করুন, তাহলেই দূরত্বটা জানা হয়ে যাবে আপনার, এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হবে না। শুধু রেঞ্জফাইণ্ডার হিসেবে নয়, লেযারকে আরো নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু আসল কথায় আসছি এবার, লেযারের একটা খারাপ দিকও আছে।'

'কি সেটা?'

'লেযারে ব্যবহার করা হচ্ছে আলো,' বললো জুনেস্কি। 'এবং আলো জিনিসটাকে সহজেই বাধা দেয়া যায়। আলো, তা সে যতো শক্তিশালীই হোক, পুরু একটুকরো মেঘের কাছেও অসহায়, ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে না। এটাই তার মস্ত দুর্বলতা।'

'কিন্তু এক্স রে-র সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে,' মৃদু গলায় বললো রানা।

'ঠিক। একটা এক্স-রে লেযার তৈরি করা তত্ত্বগতভাবে অসম্ভব নয়, কিন্তু স্রেফ এক জায়গায় একটা কিন্তু আছে। রঞ্জনরশ্মি ভেদ করে যায়, প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু প্রতিফলন ঘটাতে না পারলে এক্স-রে দিয়ে লেযার তৈরি হবে কিভাবে? গোটা ব্যাপারটাই তো নির্ভর করছে গুণিতক হারে প্রতিফলন সৃষ্টির ওপর। আজ পর্যন্ত কেউ এক্স-রে-র প্রতিফলন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেনি, শুধু নিকোলাই ফিলাতভ ছাড়া। যুদ্ধের আগে তিনি এই যুগান্তকারী কৌশলটা আবিষ্কার করে রেখে গেছেন।'

দু'টো আঙ্গুল দিয়ে থুতনি ঘষছে রানা, থলথলে ভাবটা অনুভব করছে, ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে কৃত্রিম পদার্থটার সান্নিধ্যে। 'এ ধরনের একটা যন্ত্রকে কি কাজে লাগানো হবে?'

'ধরুন, ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল স্পীডে আসছে একটা মিসা-

ইল, সাথে একটা অ্যাটমিক্ ওয়ারহেড। এটাকে ধ্বংস করতে হলে আপনারও একটা মিসাইল ছুঁড়তে হবে। ধরুন, আমেরিকান স্প্রিণ্ট জাতীয় একটা মিসাইল ছুঁড়লেন আপনি। কিন্তু সোজাসুজি শত্রুর মিসাইলের দিকে তাক করলে চলছে না, আপনি লক্ষ্য স্থির করছেন অন্য জায়গায়। এমন এক জায়গায়, যেখানে শত্রু মিসাইল যখন পৌঁছাবে তখন যেন আপনার মিসাইলও সেখানে পৌঁছে। এর আয়োজন করতে মূল্যবান সময় খরচ হয়, তার সাথে লাগে প্রচুর কমপিউটিং পাওয়ার। কিন্তু, আপনার হাতে যদি একটা এক্স-রে লেযার থাকে? আপনি সেটার লক্ষ্য স্থির করবেন সরাসরি শত্রু মিসাইলের দিকে, কারণ আপনি জানেন আপনার লেযারের গতি আলোর গতির সমান—এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল—এবং, শত্রু মিসাইলটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে যাবে আপনার রশ্মি—মেঘ বা অন্য কিছুতে আটকাবে না।'

'মাই গড!' বললো রানা। 'এ তো মারণরশ্মি!' ভুরু কুঁচকে পপকিনের দিকে ফিরলো ও। 'যথেষ্ট শক্তিশালী করে তৈরি করা সম্ভব এটা?'

পপকিন হাসছে।

'প্রথম আবিষ্কার হওয়ার পর অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে লেযার,' শান্ত ভঙ্গিতে বললো জুনেস্কি। 'বড়সড় কর্ম কাণ্ডে আজকাল ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা হয় না। একটা রকেট ইঞ্জিনের সাহায্যে পাওয়ার সাপ্লাই করা হয়। ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ হর্স পাওয়ার অর্জন করা সম্ভব হয়েছে—তবু, তবু এটা একটা সাধারণ আলো। এক্স রে তা নয়, এর সাহায্যে ইচ্ছে করলে যে কোনো উপগ্রহকে কক্ষচ্যুত করে দিতে পারবেন আপনি।'

'তাৎপর্য কি, বুঝেছো এবার?' প্রশ্ন করলো পপকিন। জানালার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালো রানার দিকে। এগিয়ে আসছে।

উঠে দাঁড়ালো রানা। অভিভূত মুগ্ধ বিস্মিত দেখাচ্ছে ওকে। এগিয়ে গিয়ে পপকিনের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ও। করমর্দনের জন্যে। 'মিঃ পপকিন, আমার মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। খাপে খাপে মিলে গেছে সব, কোথাও এখন আর কোনো খটকা নেই। আমাদের দেশ এমন একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী হতে যাচ্ছে, ভাবতেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি আমি। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি সেদিন আর দূরে নয় যেদিন প্রাণপ্রিয় স্বদেশ দুনিয়ার বুকে প্রচণ্ড এক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে...'

আবেগে কাঁপছে রানা। পপকিন আর জুনেস্কি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। হাসছে নিঃশব্দে।

রানার হাতটা ছেড়ে দিলো পপকিন। 'ধন্যবাদ, রানা। তোমার দেশপ্রেমের অনেক প্রশংসা শুনেছি আমরা। তুমি আমাদের গর্ব। এখন শুধু ভালোয় ভালোয় এই কাজটা শেষ করতে পারলেই...'

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না,' দৃঢ় স্বরে বললো রানা। 'ভুলে যাচ্ছেন কেন আমি একজন জিওনিস্ট এজেন্ট। এমন অভিনয় করবো, ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করতে পারবে না যে আমি আন্তন ফিলাতভ নই।'

বারো

ছেলেমেয়ের বাপ হওয়া যে কি বিপদ, হাড়ে হাড়ে টের পেতে শুরু করেছে রানা। বেলা সাড়ে বারোটার সময় নিজে কামরা থেকে টেলিফোন করে ঘুম জড়ানো আদুরে গলায় জানিয়েছে লরেলি 'আব্বু, তুমি যদি আমাকে লাঞ্চের দাওয়াত দাও, আমি তোমাকে ডিনারের দাওয়াত দেবো—রাজি ?'

'রাজি,' বলেছে রানা। 'কিন্তু একটা শর্তে।'

'এর মধ্যে আবার শর্ত ? আচ্ছা, বলো, শুনি।'

'কাল থেকে যদ্দিন আছো অসলোয়, প্রতিদিন তিনবেলা আমার দাওয়াত রক্ষা করতে হবে তোমাকে।'

'যাহ্, এতোটা তুমি সহ্য করতে পারবে না। সারাক্ষণ আমি যা বকবক করি, সইবেই না তোমার। বড়জোর একটা দিন কোন-মতে কাটবে, তারপর বকুনি আর ধমক খেতে খেতে কলজে শুকিয়ে যাবে আমার। না—তার চেয়ে এসো এক কাজ করি, শুধু ডিনারটা একসাথে খাবো আমরা, একদিন তুমি খাওয়াবে, পরদিন আমি, এভাবে—কি বলো ?'

'বেশ,' বললো রানা। 'তাই হবে। কিন্তু তোমার সান্নিধ্য আমার ভালো লাগবে না, এ তোমার ভুল ধারণা, লরেলি।'

'তাই বুঝি?' লরেলি সকৌতুকে বললো। 'যা বদলেছো, হতেও পারে। আমার ধারণা যদি ভুল প্রমাণিত হয়, সবচেয়ে খুশি হবো আমি। সে থাক, দেড়টায় আসছি আমি, কেমন? এর মধ্যে ছোট্ট আরো একটা ঘুম দিয়ে নিই।'

'ভালো কথা, লরেলি,' একটু ইতস্তত করে বললো রানা, 'আমার এক পরিচিতা ভদ্রমহিলার সাথে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে চাই আমি। তোমার কথা বলেছি ওকে, আলাপ করার জন্যে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে...'

অপর প্রান্তে কোনো সাড়া নেই।

'লরেলি?'

'ঠিক আছে, আব্বু,' নিস্তেজ গলায় বললো লরেলি, 'আমিও খুশি হবো তার সাথে পরিচিত হয়ে।' ইচ্ছা নেই, তবু ভদ্রতার খাতিরে আবার বললো, 'ওকে নিশ্চয়ই তুমি লাঞ্চে দাওয়াত করছো, তাই না? সেক্ষেত্রে আমারও বোধহয় উচিত হবে ওকে ডিনারের দাওয়াত করা, নাকি?'

বুদ্ধি করে বললো রানা, 'সে তোমার ইচ্ছা।'

বুদ্ধির দৌড়ে বাপ্‌কে আরেক ধাপ টপকে গেলো মেয়ে। 'বুঝেছি, আব্বু।'

অপ্রতিভ বোধ করলো রানা, 'বুঝেছো মানে?'

উত্তরে শোনা গেলো ফোনের কানেকশন কেটে দেবার শব্দ। বাবার সাথে কোনো মহিলার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেছে লরেলির। ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তিত হলো

রানা। কিন্তু জুলির কথা ভেবে চিন্তাটাকে মন থেকে দূর করে দিলো ও। মানুষকে সহজেই আপন করে নেবার আশ্চর্য একটা গুণ আছে জুলির, তাকে বিরূপ চোখে দেখার কোনো কারণই খুঁজে পাবে না লরেলি।

হলোও প্রায় তাই। লাঞ্চে গিয়ে দেখা গেলো লরেলিকে নিয়ে জুলি সারাক্ষণ ব্যস্ত। গুম মেরে ছিলো প্রথম দিকে লরেলি, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে তার মেজা বদলে গেলো, মন খুলে তাকে হাসতে হলোই। ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর মতো হয়ে উঠলো দু'জন। তবে, যখনই জুলি আর রানা কথা বলেছে, সতর্ক চোখে ওদেরকে লক্ষ্য করেছে লরেলি। দু'জনের সম্পর্কটা ঠিক কি ধরনের, বুঝে নিতে চেয়েছে সে।

লাঞ্চ সেরে একটা কফিহাউসে গেলো ওরা। কফি খেয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরোলো। 'চলো, সামনেই বইয়ের দোকান, তোমাকে কিছু বই কিনে দিই,' লরেলিকে বললো রানা। 'তুমি ঠিক কি ধরনের বই পড়লে আমি খুশি হবো, সেটাও জানা হয়ে যাবে তোমার এই সুযোগে।'

বুদ্ধিমতী মেয়ে, বাপের কথার মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা অর্থ আছে বুঝতে পেরে প্রথমে হকচকিয়ে গেলো, তারপর অনুমান করে নিলো নিশ্চয়ই ওর ব্যাগের বই ক'টা চোখে পড়েছে বাবার। লজ্জা বোধ করলো সে। দোষ স্খালনের জন্যে মৃদু কণ্ঠে বললো, 'এ ব্যাপারে আরো আগে যদি কিছু সবক দিতে, ভালো হতো। স্বীকার করছি আজেবাজে কিছু বই বন্ধুরা আমাকে গছিয়ে দিয়েছে।'

প্রসঙ্গটা নিয়ে কেউই আর কথা বাড়ালো না। জুলি গোটা ব্যাপারটা শুনেছে রানার কাছ থেকে, কিন্তু সে এমন ভান করে রইলো যেন কিছুই জানে না।

বিরাট একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে ঢুকলো ওরা। লরেলির জন্যে একগাদা বই কিনলো রানা। 'এবার আমার জন্যে কিছু বই, বললো ও। হাত নেড়ে কাছে ডাকলো লাইব্রেরিয়ান লোকটাকে।

লোকটা যুবক। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সাদা একটা গ্যাবার্ডিনের স্যুট পরে আছে। 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?' রানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো সে।

পাইপে টোবাকো ভরছে রানা। মুখ তুলে বললো। 'আমি একটা দুষ্প্রাপ্য বই খুঁজছি। তোমাদের শো-কেসে তো নেই। হয়তো গোডাউনে থাকতে পারে।'

'দয়া করে যদি বইয়ের নামটা বলেন…'

'লেখকের নাম মনে নেই,' পাইপে আগুন ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লো রানা। 'বিশেষ এক ধরনের রান্না শেখার বই।'

'আব্বু। রান্না শেখার বই…?' বাপের কাঁধে হাত রাখলো লরেলি, চোখ কপালে উঠে গেছে তার।

'তোমাকে নিজের হাতে কিছু রেঁধে খাওয়াতে চাই,' অমায়িক হেসে বললো রানা। তাকালো লাইব্রেরিয়ানের দিকে। 'বইটার নাম Salmagundi or Salmagundy. টুকরো মাংসের সাথে ভিনিগার, ডিম, মরিচ ইত্যাদি আর যেন কি কি সব দিয়ে তৈরি করতে হয় ডিশটা…'

'কি…কি বললেন?' বিস্ফারিত হয়ে গেছে লাইব্রেরিয়ানের চোখ দু'টো। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে।

আব্বুকে পাগল ঠাওরেছে লোকটা, ভাবছে লরেলি। একটু রূঢ় গলায় বললো সে, 'কানে কম শোনেন নাকি? বইটা আছে কিনা বলুন না?'

'না···মানে,' দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করছে লোকটা। কিন্তু রানার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। 'বইটা বোধহয় নেই, স্যার। আপনার কি আগামীকাল সময় হবে? খুঁজে দেখবো, যদি পাই···'

'উঁহু,' বললো রানা, 'আর হয়তো সময় পাবো না। আচ্ছা, ধন্যবাদ।' লরেলির হাত ধরলো রানা। জুলিকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'তুমি যদি একটু ট্রেনিং দাও আমাকে, তাহলেই আমি রেঁধে খাইয়ে মেয়ের প্রশংসা আদায় করতে পারি' ঘুরে দাঁড়াতে যাবে রানা, হঠাৎ কি মনে করে আবার তাকালো লাইব্রেরিয়ানের দিকে। লোকটা তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি 'আচ্ছা, মুন রেকার আছে? মুন রেকার—নাইনথ্ এডিশন?'

ঠোঁট দু'টো নড়ছে লোকটার। সবাই বুঝলো নিজের মনে নিঃশব্দে বইটার নাম উচ্চারণ করছে সে। মাথা নাড়লো।

লোকটা পাগল নাকি? লাইব্রেরিয়ানকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভাবলো লরেলি। 'বোঝাই যাচ্ছে নেই,' বললো সে। রানার হাত ধরে টান দিলো। শ্রাগ করলো রানা। দু'পাশে জুলি আর লরেলিকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ডিনার খেতে দূতাবাস পাড়ায় গেলো ওরা। বাপকে একা বসিয়ে রেখে জুলিকে নিয়ে নিদারুণ ব্যস্ততার সাথে বেরিয়ে গেলো লরেলি রেস্তোরাঁ থেকে। পনেরো মিনিট পর ফিরলো দু'জন। লরেলির মুখে চাপা হাসি।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললো রানা, 'কোথায় যাওয়া

হয়েছিলো জানতে পারি ?'

'থিয়েটারের টিকেট আনতে,' বললো লরেলি। 'জরুরী কোনো কাজ নেই তো তোমার ?'

'আছে,' বললো রানা। 'খুব জরুরী কাজ। আমি বোধহয় যেতে পারবো না।'

কালো হয়ে গেলো লরেলির মুখ। 'টিকেট কাটা হয়ে গেছে যে!'

একটু ভাবলো রানা। পপকিন ন'টায় দেখা করতে বলেছে ওকে। এখানকার পরিবেশ নাকি ক্রমশ নাজুক হয়ে উঠছে। দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো রানা। ওর উপর নজর রাখার জন্যে পাঁচজন লোক রয়েছে এই রেস্তোরাঁতেই, বাইরে আরো অনেক বেশি লোক পাহারা দিচ্ছে। কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না পপকিন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিনল্যাণ্ডে যেতে চাইছে সে।

'ঠিক আছে,' লরেলির ম্লান মুখের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্ক-ভাবে বললো রানা, 'ফোন করে বাতিল করে দিচ্ছি অ্যাপয়েন্ট-মেন্টটা। খুশি ?'

দ্রুত মাথা নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছে লরেলি, এমন সময় হঠাৎ যেন ভূত দেখে আঁতকে উঠলো জুলি।

'কি হলো ?'

'জ্যাক জাস্টিস আর তার বউ!'

দরজার দিকে তাকালো রানা। মস্ত হাতিটা ঢুকছে। পেছনে তার সহধর্মিণী পেত্নী, লুসি।

'কারা ওরা ?' অদ্ভুত জুটির দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে লরেলি।

'আমাদের পরিচিত একটা দম্পতি,' বললো জুলি। 'দুনিয়ার

সেরা বোর ওরা। একবার যদি বসার সুযোগ পায়, তিন ঘণ্টার আগে ওঠানো যাবে না।'

'সে কি!' বাবার দিকে তাকালো লরেলি। একটা হাত চেপে ধরলো সে রানার, 'লক্ষ্মী আব্বু, কিছু একটা উপায় করো! প্লিজ!'

'বলছিস!' কৌতুকে চিকচিক করছে রানার চোখ দু'টো। 'দেখবি কেমন অভিনয় করি?' খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে কলম বের করলো রানা। 'কানের কাছে বোমা পড়লেও খেয়াল করবো না আমি বলবি আমি সাংঘাতিক একটা...

'কাজে ব্যস্ত!' রানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উৎসাহে প্রায় লাফিয়ে উঠলো লরেলি। চাপা কণ্ঠে বললো। আঁকিবুঁকি কাটো, জলদি! এসে পড়লো বলে!' হঠাৎ বিরক্তি ফুটে উঠলো লরেলির মুখে, দ্রুত একবার দেখে নিলো দরজার দিকটা, জ্যাক জাস্টিস বা তার বউ কেউ এদিকে তাকিয়ে নেই দেখে হাত তুলে রানার মাথার চুল এলোমেলো করে দিলো; 'আব্বু, তুমি কিছু জানো না। কাজ-পাগল বিজ্ঞানীর চুল উসকোখুসকো থাকে।'

নিবিষ্ট ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লো রানা কাগজের উপর। খস খস করে কি সব লিখছে। ভুরু কুঁচকে আছে ওর। সাংঘাতিক ব্যস্ত। ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে ছিঁড়ে দু' টুকরো করলো লরেলি, পাকিয়ে দু'টো গোল বল তৈরি করে রানার দু'কানে গুঁজে দিলো।

দূর থেকে শোনা গেলো জ্যাক জাস্টিসের হেঁড়ে গলা। 'ওই যে, পেয়ে গেছি শ্রোতা! গল্পটা আজ দারুণ জমবে! এগিয়ে আসছে সে পেছনে লুসিকে নিয়ে।

'ও মা, আমাদের আস্তনের সাথে ওই ছুকরীটা আবার কে!' খনখনে গলায় বললো লুসি।

'স্ স্ স্,' ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে বললো জুলি। 'আস্তন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত, কেউ যেন বিরক্ত না করে তাই আমরা পাহারা দিচ্ছি।'

তিন চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে জ্যাক জাস্টিস। তার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালো লুসি। কিছু বলতে যাবে, কিন্তু বাধা দিলো লরেলি।

'লাভ নেই,' দুষ্টুমির হাসি লরেলির ঠোঁটে। 'আব্বুর কানের দরজায় তালা মারা।'

লরেলির দিকে তর্জনী তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালো জ্যাক জাস্টিস। ফিস ফিস করে বললো, 'মেয়ে, আস্তনের মেয়ে, বুঝলে?'

'মনে হচ্ছে দজ্জাল মেয়ে,' খোনা গলায় বললো লুসি। তীব্র কটাক্ষ হানলো লরেলির দিকে। 'ইঁচড়ে পাকা। চলো, যাই···

যাবার ইচ্ছে নেই জ্যাক জাস্টিসের, কিন্তু লুসি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

হাসি চেপে রাখতে পারছে না লরেলি, জুলির কাঁধে মুখ লুকিয়েছে।

কোণার একটা টেবিলে গিয়ে বসেছে জ্যাক জাস্টিস। 'এই সুযোগে কেটে পড়া যেতে পারে,' বললো জুলি।

অমনি উঠে দাঁড়ালো রানা। হন হন করে দরজার দিকে এগোচ্ছে। খবরের কাগজটা পড়ে থাকলো টেবিলেই। জুলি আর লরেলি দ্রুত অনুসরণ করলো ওকে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়েই তিনজন ফেটে পড়লো অদম্য হাসিতে। বাপের কান থেকে কাগজের বল দু'টো বের করলো লরেলি। 'ভাগ্যিস কিছু শুনতে পাওনি। তা নাহলে কি হতো বলা যায় না।'

'কেন ? কেন ?' ঘাড় ফিরিয়ে খালি টেবিলটা দেখলো রানা।

'নিগ্রো মেয়েটা আমাকে কি বলেছে জানো ?'

শার্টের আস্তিন গুটাচ্ছে রানা, 'কি বলেছে ?'

আরেকবার খিলখিল করে হেসে উঠলো লরেলি আর জুলি। 'থাক,' বললো লরেলি। 'মেয়েলোকের কথায় কান দিতে নেই।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, মাফ করে দিলাম ওকে,' বললো রানা। আড়চোখে দেখলো পত্রিকাটা তুলে নিচ্ছে একজন।

গভীর রাতে নক হলো দরজায়। পপকিনের গলা শুনে দরজা খুলে দিলো রানা। করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। হাত দু'টো ট্রাউজারের দু'পকেটে ঢোকানো। চোখাচোখি হতে হাসলো। ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিলো রানা। ঘুরলো

চেয়ারে বসে চুরুট ধরাচ্ছে পপকিন। 'আর দেরি না করে রওনা হতে চাইছি আমরা। কোনো অসুবিধে আছে তোমার ?'

'লরেলিকে কি বলবো ?' এগিয়ে এসে পপকিনের সামনে চেয়ারে বসলো রানা।

'কিভাবে নিচ্ছে তোমাকে সে ?'

'চেহারাটা বাপের, তাই বাপ বলেই মেনে নিয়েছে' বললো রানা। 'কিন্তু আচরণটা বাপের নয়, প্রতিদিন পঞ্চাশ বার করে শুনিয়ে দিচ্ছে কথাটা।'

'ধরতে পারেনি, তাই না ?'

'পারেনি। তবে, পারবে।'

'ভাবছিলাম,' বললো পপকিন। 'সাথে করে ওকে নিয়ে গেলে কেমন হয় ? ফেউয়েরা কি ভাববে ?'

'হোয়াট?'

'চিন্তা করে দেখো ব্যাপারটা,' বললো পপকিন। চেক করে ওর পরিচয় জেনে নেবে ওরা, যখন জানবে ও ফিলাতভের মেয়ে, তোমার আইডেনটিটি সম্পর্কে ওদের কারো মনে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। তোমার কাভারের জন্যে এটা খুব কাজ দেবে।'

'আমি ওর নিরাপত্তার কথা ভাবছি,' বললো রানা। 'আপনি গ্যারান্টি দিতে পারেন?'

'অবশ্যই।' বললো পপকিন। 'সেদিকটা তো আমি দেখবই।'

অনেকক্ষণ ভাবলো রানা। 'ঠিক আছে, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখবো।' আরো খানিক ভাবলো রানা। 'আপনি চাইছেন ফিনল্যাণ্ডে নিয়ে যাই ওকে। আমি চাইছি না। এতে ওর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়বে, সেই সাথে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার ঝুঁকিটাও। ও যদি টের পেয়ে যায়, তার জন্যে আমাকে দায়ি করতে পারবেন না।'

'ওর বাপ যে ধরনের আচরণ করতো ওর সাথে, ঠিক সেই ধরনের আচরণ যদি করো...'

'দুঃখিত,' বললো রানা। 'যতদূর বুঝতে পেরেছি, মেয়ের সাথে ফিলাতভ পশুর মতো আচরণ করতো। আমি তা চেষ্টা করেও পারবো না।' হঠাৎ তিক্ত হাসলো রানা, 'তবে আমার আচরণে এমনিতেও যথেষ্ট আঘাত পাচ্ছে ও। একটা খেলনা ভাল্লুক, সেটার নাম আমি ভুলে গেছি দেখে আজ থিয়েটার থেকে ফিরে এসে কেঁদে ফেলেছে ও। এ-ধরনের আরো অনেক ঘটনা ঘটছে।'

'শুভ লক্ষণ,' বললো পপকিন। 'এ ধরনের আঘাত পেয়েই অভ্যস্ত ছিলো মেয়েটা। যাই হোক, কাজের কথাটা বলি এবার।

আগামীকাল বিকেলে হেলসিঙ্কিতে প্রফেসর পেন্টি ক্যারিয়ানেন-এর সাথে তোমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তোমার সেক্রেটারি সব ব্যবস্থা করেছে ?'

'প্রফেসর…ইনি আবার কে।'

'নিকোলাই ফিলাতভের সহকারী ছিলেন। তোমার কাজ হলো নিকোলাইয়ের ছেলে হিসেবে পরিচয় দিয়ে যথাসম্ভব তথ্য বের করে নেয়া। বিশেষ করে জানতে চেষ্টা করবে তুমি, ১৯২৯ পর্যন্ত নিকোলাই তাঁর ল্যাবরেটরীতে ঠিক কি ধরনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর এক্স-রে-র ওপর রিসার্চ সম্পর্কে আর কেউ কোনো খবর রাখে কিনা জানতে চাই আমি।'

পরদিন সকালে ওরা সবাই প্লেনে চড়ে ফিনল্যাণ্ডে পৌঁছুল।

বাপকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছে লরেলি। এটা তার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে বাপের কাছ থেকে অবহেলা পেয়ে অভ্যস্ত ছিলো সে, তাই বাপের প্রতি তার নিজেরও তেমন ভালবাসা ছিলো না। কিন্তু বাপ আর সে-বাপ নেই। সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। মেয়ের জন্যে এতো ভালবাসা ছিলো তার বুকে, বিশ্বাস করাই কঠিন। এতো ভালবাসা সইবে তো ?

অপ্রত্যাশিত ভালবাসা আর স্নেহ পেয়ে লরেলির মধ্যেও বাপের প্রতি উথলে উঠেছে শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। বাপের স্বাস্থ্য, মেজাজ, সুবিধে-অসুবিধে ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে সে একটা দায়িত্ব বোধ করছে। প্রতিদান দেবার জন্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয় তাকে। এই অপ্রত্যাশিত ভালবাসা থেকে আবার যাতে বঞ্চিত হতে না হয় সেজন্যে বাপের মন যুগিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তাটুকু ভাল-

ভাবেই অনুভব করছে সে। হারাবার একটা ভয় সব সময় বুকে চেপে আছে তার।

ফিনল্যাণ্ডে যাবার প্রস্তাব পেয়ে সাংঘাতিক খুশি হয়েছে ও। ও যে সাবালিকা হতে চলেছে, সাথে করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটা তারই স্বীকৃতি হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু মাঝখানে জুলির উপস্থিতিটাকে এখনো মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি ও। মেয়েটা ভালো, অস্বীকার করার উপায় নেই ওর। ওর সাথে তো অদ্ভুত ভালো আচরণ করে। ওর নিজের মা-ও এতোটা যত্ন নেয়নি ওর, জুলি যেমন নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত জুলি যদি বাপের সাথে একটা স্থায়ী সম্পর্কে বাঁধা পড়ে, খারাপ লাগবে ওর, আঘাত পাবে মনে, কিন্তু ঘৃণা করবে না জুলিকে। ঘৃণা করা যায় এমন মেয়ে নয় জুলি।

আরো একটা ব্যাপারে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে লরেলি। অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে সে বাপের স্বভাবে। কথা বলার সময় হঠাৎ হঠাৎ এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে কোনরকম কারণ ছাড়াই। এ-ধরনের যতগুলো ঘটনা ঘটেছে প্রতি-বার অদ্ভুত ভাবে হেসেছে বাবা ওর দিকে তাকিয়ে। কি যেন একটা ঘাপলা আছে কোথাও, কিন্তু ধরতে পারছে না লরেলি।

স্মৃতিও দুর্বল হয়ে গেছে বাবার। এটা তার আরেকটা উদ্বেগের কারণ। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অথচ বেমালুম ভুলে বসে আছে বাবা। স্মরণ করিয়ে দিলেও মনে করতে পারে না—অথচ, যেন ভোলেনি, এই রকম ভাব দেখাতে গিয়ে হুঁ-হ্যাঁ করে। ভাল্লুকটার কথাই ধরা যাক। বাপের দেয়া প্রেজেণ্টেশন ওটা, নামকরণও বাবা করেছে, অথচ ওটার কথা কিছুই তার মনে নেই।

যাই হোক, ফিনল্যাণ্ডে বাবা ওকে নিয়ে এসেছে বলে ও বাবার

প্রতি কৃতজ্ঞ। জিজ্ঞেস করেছিলো, 'ইউনিভার্সিটির এই প্রফেসরের কাছে কেন যাচ্ছো আব্বু?'

উত্তরে বলেছে রানা, 'আমার বাবার সহকর্মী ছিলেন এই ভদ্রলোক, বাবার সম্পর্কে কিছু জানার জন্যে যাচ্ছি। যাবে তুমি?'

'দাদুর কথা জানতে পাবো, যাবো না মানে।' উৎসাহের সাথে বলেছে লরেলি।

লরেলির হাত ধরে ইউনিভারসিটির স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আসছে রানা। 'উনি খুব জ্ঞানী লোক তাই না, আব্বু?'

অন্যমনস্কভাবে 'হুঁ' বললো রানা। পপকিনের কথা ভাবছে ও। অহেতুক সন্দেহে ভুগছে লোকটা। পক্ককেশ বৃদ্ধ পেন্টি ক্যারিয়ানেন-এর কাছ থেকে যা জানা গেছে তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছুই নেই তার। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের দিকে বুড়ো নিকোলাই ফিলাতভ এক্স-রে-র উপর রিসার্চ করলেও, ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে এমন কেউ এখন আর জীবিত নেই। বুড়োর সহকারীরা সবাই মারা গেছে ইতিমধ্যে। একমাত্র সহকারী পেন্টি ক্যারিয়ানেন জীবিত থাকলেও, নিকোলাইয়ের তখনকার কাজকর্ম সম্পর্কে বিশদ কিছুই জানে না।

'আমার মনে হচ্ছিলো,' বললো লরেলি, 'পটিয়ে পাটিয়ে ভদ্রলোকের কাছ থেকে কি যেন তথ্য বের করার চেষ্টা করছো তুমি।'

এতো চালাক হওয়া ভালো নয়—ভাবলো রানা। প্রকাশ্যে বললো, 'অনেকটা ঠিকই ধরেছো বাবার সম্পর্কে কিছুই জানি না, তার কাজ কর্ম সম্পর্কে তো একেবারেই অজ্ঞ, চেষ্টা করছিলাম...

'তা নাহয় বুঝলাম,' নাছোড়বান্দার মতো বললো লরেলি কিন্তু তোমার সম্পর্কে ভদ্রলোক যতগুলো প্রশ্ন করলেন, লক্ষ্য করলাম

সবই তুমি চমৎকার কৌশলে এড়িয়ে গেলে। কেন বলো তো?'

'সময় বাঁচাবার জন্যে,' ভারি গলায় বললো রানা। 'বুড়ো মানুষ, গল্প পেলে মেতে উঠবেন, তোমাকে নিয়ে আর সিবেলিয়াস মেমোরিয়্যাল দেখতে যাওয়া হবে না, তাই।'

'উঁহু,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো লরেলি। 'সেটা কোনো কারণ নয়। আব্বু, তুমি কি যেন লুকাচ্ছো আমার কাছে!' মেয়ের কণ্ঠস্বরে অভিমান।

'ছাড়বেই না যখন, তাহলে সত্যি কথাটাই বলি, বললো রানা। 'আমার বেশির ভাগ কাজ ডিফেন্স সংক্রান্ত। বিদেশে এসে নিজের সম্পর্কে যতো কম কথা বলা যায় ততোই ভালো। এবার বুঝেছো?'

বুঝতে চাইছে না লরেলি। মেনে নিতে পারছে না রানার যুক্তি। গম্ভীর হয়ে আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললো, 'বোধ হয়।'

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছে ওরা। পথে কেউ কারো সাথে কথা বললো না।

'দেখতে ঠিক যেন একটা অরগ্যান, তাই না, আব্বু?' ধারণাটা সমর্থন করবে বাবা, এই আশায় রানার মুখের দিকে তাকালো লরেলি। 'কী-বোর্ড থাকলে বাজানো যেতো। ভাবতে বেশ একটু আশ্চর্য লাগে, সিবেলিয়াস একজন অর্কেস্ট্রাবাদক ছিলেন, তাই তো, নাকি?'

'বোধ হয়,' বললো রানা। গাইড বুকে দ্রুত চোখ বুলালো ও। 'ওজন আটাশ টন, এবং একটা মেয়ের হাতে তৈরি। কাজটাকে তুমি নারী স্বাধীনতার প্রাচীন নমুনা হিসেবে ধরতে পারো। এসো, বসি, কতো জাতের টুরিস্ট আসছে ওদের প্যারেড দেখা যাক।'

বাস থেকে একদল লোক নামছে। বেঞ্চিতে বাপের গা ঘেঁষে বসলো লরেলি। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে নবাগত ভ্রমণবিলাসীদের দিকে, কিন্তু নিচের ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবছে সে। স্টকটন আর জুনেস্কিকে মনুমেন্টের নিচে দিয়ে অলস ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখতে পাচ্ছে রানা। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সাগরের দিকে তাকালো ও। মেঘহীন নীলচে আকাশের গায়ে গাঢ় নীল পতাকার মতো বাতাসে উড়ছে ইয়টের পালগুলো। ভাবছে রানা, কবে নাগাদ রওনা হতে বলবে ওকে পপকিন ?

'কি সুন্দর, না?' বাপের দৃষ্টি অনুসরণ করে সাগর দেখছে লরেলি। 'ফিনল্যাণ্ড যে এতো সুন্দর, স্বপ্নেও ভাবিনি। মেডিটারেনিয়ানের তীরের কোনো দেশ মনে হয়, অনেকটা ইবিজার মতো সেই যে ওখানে গিয়েছিলাম—তোমার মনে আছে, আব্বু?'

'হুঁ-হুঁ,' মৃদু গলায় বললো রানা।

হাসছে লরেলি। 'সেই বিদঘুটে হোটেলটার কথা এখনো আমার মনে আছে, গরম পানি পাওয়া যায় না শুনে সে কি রাগ তোমার। কি যেন নাম ছিলো মালিকটার—ইয়া মোটা লোকটা?'

'মনে নেই,' বললো রানা। মনে নেই বলাতে তেমন কোনো ঝুঁকি নেই, ভাবছে রানা, যার সাথে দেখা হবে তার নামই মনে রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

'তারপরই জঘন্য ঘটনাটা ঘটলো। আমি তো কেঁদেই মরে যাচ্ছিলাম। ওরা তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। যন্ত্র দিয়ে পেট থেকে কি সব বের করলো একগাদা। বললো সি ফুড পচা ছিলো, ফুডপয়জনিং হয়েছে।'

'পেটটা আমার চিরকালই একটু অবাধ্য,' বলেই বুঝলো রানা,

বোধহয় ভুল করে ফেললো। ফিলাতভের পেট সম্পর্কে তার এই ধারনা সম্পূর্ণ ভুলও হতে পারে। কিন্তু লরেলি প্রতিবাদ করলো না দেখে হাঁফ ছাড়লো একটা। সাগরের দিকে হাত তুলে দেখালো ও। 'ওখানে বোধহয় ওই ইয়টগুলো রেস করছে ?'

'হ্যাঁ,' বললো লরেলি, 'ইয়টগুলোকে দেখে আমাদের হেসপেরিয়ার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, আব্বু। এই গ্রীষ্মে তুমি যদি ওটা নিয়ে সাগর ভ্রমণে না বেরোও বেরুবে নাকি। সে কম কিছু ভেবেছো ?'

'এখনো ঠিক করিনি কিছু,' গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো রানা। 'সময় পাবো বলে মনে হয় না...

'আগেই জানিয়ে দিয়ো আমার বন্ধুরা আমাকে ধরেছে, ওদেরকে নিয়ে আমিই বেরুবো কিনা ভাবছি।'

কি বলবে রানা ? এখন চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'চুপ করে আছো কেন ?' লরেলি বললো, 'দেখো আব্বু, আনন্দটা মাটি করো না কিন্তু। জিম কাকাকে জানিয়েছি, সে আমাকে কথাও দিয়েছে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। এখন তুমি অনুমতি দিলেই হয়। ওটা যখন তোমারই ইয়ট।'

'ঠিক আছে,' বললো রানা। 'কিন্তু সাবধান, কোনো বিপদ ঘটিয়ে বসো না আবার।'

'দু'বছর আগে নতুন একজোড়া পাল কিনতে চেয়েছিলে তুমি—কিনেছিলে ?'

'হ্যাঁ,' দ্রুত উঠে দাঁড়ালো রানা। 'চলো যাই। হোটেলে একজনের সাথে দেখা করবো কথা দিয়েছি, বেচারা অপেক্ষা করবে।'

'সবই বড় রহস্যময়,' বললো লরেলি, 'সত্যি কোনো অ্যাপয়েন্ট-

মেন্ট আছে, নাকি,' জোর করে হাসছে মেয়েটা, 'স্রেফ অজুহাত?'

অস্বস্তি বোধ করছে রানা। কষ্ট করে হাসলো। 'না-না, অজুহাত হবে কেন! আসলে জ্যাক জাস্টিসকে কথা দিয়েছি ওর সাথে ড্রিঙ্ক করবো, এই আর কি।' কথাটা মিথ্যে নয়।

বিস্ময় ফুটে উঠলো লরেলির চেহারায়। 'ওরাও ফিনল্যাণ্ডে এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করায় বললো, দুনিয়াটা গোল, ঘুরে ফিরে নাকি সবার সাথে দেখা হয়ে যায় সবার।'

'হুঁ,' বললো লরেলি। গম্ভীর। 'চলো তাহলে।'

হোটেলে ফিরলো ওরা। লবি পেরিয়ে এলিভেটরের দিকে যাচ্ছে। 'তোমার কামরায় যাবো, কিছু মনে করবে?' লবির চার-দিকে তাকালো লরেলি। 'তোমার সাথে কথা আছে।'

'কি কথা?'

হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে হাত তুললো লরেলি। 'অনেক কথা। তার মধ্যে একটা ওই লোকটা সম্পর্কে। কে ও?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই জুনেস্কিকে দেখতে পেলো রানা।

'ওর মতো আরো ডজন দু'য়েক লোক আছে। যেখানেই যাচ্ছি আমরা, পিছু লেগে থাকছে।' চাপা গলায় বললো লরেলি। 'কেন?'

'তুমি তো জানোই আমি ডিফেন্সের হয়ে কাজ করি।' হাসলো রানা, 'আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে তাদের একটা দায়িত্ব আছে।'

খুশি হলো না লরেলি। প্রচণ্ড ভাবাবেগ দমন করে রেখেছে সে, মুখ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা।

'আমার মনে হয় সব কথা খুলে বললে তুমি ভালোই করবে। তোমার, না আমার কামরায়?' জেদের সুরে বললো লরেলি।

থমকে গেছে রানা। ঝড়ের পূর্বাভাস পাচ্ছে। 'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দিয়ে বললো ও।

এলিভেটরে চড়ে চারতালায় উঠলো ওরা। তালা খুলে পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালো রানা। লরেলির পিছু পিছু ঢুকলো কামরায়। 'আর কি কথা লরেলি?'

'আর··· আন্তন, কোথাও তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছো।' ধীরে ধীরে বিছানায় বসলো লরেলি। 'কেন?'

'ফাঁকি?' মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলো রানা।

'অস্বীকার করতে পারো?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে লরেলি রানার চোখের দিকে। জ্বলজ্বল করছে চোখ দু'টো।

'ফাঁকি?' ঢোক গিলে বললো রানা। 'না তবে কিছু রহস্য আছে। যা তোমাকে বলা যায় না। আমার ব্যবসার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো লরেলি। চোখে পলক নেই। শির-দাঁড়া খাড়া। মুখের চেহারা থমথম করছে। ডান হাতে খামচে ধরে আছে চাদরটা। 'আমার ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমার ওপর যাতে কোনো হামলা···'

'সেজন্যে নয়।'

'তাহলে?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলো রানা। ঘামতে শুরু করেছে ও।

'ভয় লাগছে তোমাকে চিনতে পারছি না বলে···কোথাও গোল-মাল আছে···'

দ্রুত থামিয়ে দিলো লরেলিকে রানা। 'এ তোমার কল্পনা।' উঠে দাঁড়ালো সে। 'লরেলি, এবার বোধহয় থামা উচিত।' কঠিন

একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে রানা চেহারায়। 'তুমি প্রলাপ বকছো।'

'না, থামবো না!' গলাটা কেঁপে গেলো লরেলির। ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালো সে-ও। 'সিবেলিয়াস মেমোরিয়্যালের গোটা ইতিহাস তোমার জানা, কেননা তুমি একজন ফিন। অথচ, এখন তুমি কিছুই জানো না।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলো রানা, ওকে থামিয়ে দিলো লরেলি।

কাঁপছে মেয়েটা। 'সব গোলমাল করে ফেলেছো তুমি। ধরা পড়ে গেছো। ইবিজায় জীবনে কখনো যাইনি আমি, এবং আমার জানা মতে, ফুড পয়জনিংয়ের জন্যে কখনো তোমাকে হাসপাতালে যেতে হয়নি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেছে রানা। 'লরেলি!'

গলা চড়ছে লরেলির। চোখ দু'টো কুঁচকে উঠেছে। 'হেসপেরিয়া নামে কোনো ইয়ট নেই কোথাও—আর ওই লোকটা, জিম কাকা, তারও কোনো অস্তিত্ব নেই। অথচ একটা অস্তিত্বহীন ইয়টের জন্যে তুমি একজোড়া পালও কিনেছো!'

রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে। বোঝা যাচ্ছে, সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে সে।

কাঁপুনিটা থামছে না। চিৎকার করে উঠলো অকস্মাৎ, 'তুমি আমার বাবা হতে পারো না!' পরমুহূর্তে খাদে নেমে গেলো লরেলির গলা। অসহায়, বিমূঢ়, আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তাকে। ফিসফিস করে বললো, 'তুমি আমার আব্বু নও! কে তুমি?'

[দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য।]